

গাববু

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

১

খাবার টেবিলে বসে আববু এদিক সেদিক তাকালেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, “গাববু খেতে আসে নাই?”

আববুর কথাটা একটা প্রশ্নের মতো শোনাতেও এটা আসলে প্রশ্ন না, কারণ দেখাই যাচ্ছে গাববু নাই। সে কখনো কোথাও থাকে না। তাকে আনতে হলে প্রথমে ডাকাডাকি করতে হয়, তারপর চেষ্টামেচি করতে হয়, সবার শেষে কাউকে গিয়ে তাকে ধরে আনতে হয়। আববু ডাকাডাকি শুরু করলেন, “গাববু? খেতে আয়।”

গাববু কোনো সাড়াশব্দ করল না। তখন আম্মু চিৎকার করলেন, “এই গাববু! ডাকছি কথা কানে যায় না?”

এবারেও গাববু উত্তর দিল না, উত্তর দেবে সেটা অবশ্যি কেউ আশাও করেনি। টুনি তখন গাববুকে ধরে আনার জন্যে উঠে দাড়াল তখন সবাইকে অবাক করে দিয়ে গাববু নিজেই হাজির হল। সে অবশ্যি এমনি এমনি হাজির হল না, সে হাজির হল ঘুরতে ঘুরতে। দুই হাত দুইদিকে ছড়িয়ে দিয়ে সে সাইক্লোনের মতো ঘুরতে ঘুরতে খাবার টেবিলের দিকে অগ্রসর হতে থাকে।

গাববুকে এভাবে ঘুরতে ঘুরতে এগিয়ে আসতে দেখে কেউই একটুও অবাক হল না, তার কারণ সে সবসময়েই এরকম কিছু না কিছু করছে। তারপরেও আববু আর আম্মু অবাক হওয়ার ভান করলেন, আববু বললেন, “এটা কী হচ্ছে গাববু?”

গাববু বলল, “কিছু না।”

আম্মু বললেন, “কিছু না মানে? এভাবে ঘুরছিস কেন?”

গাববু কোনো উত্তর দিল না, তখন আম্মু ধমক দিয়ে বললেন, “এভাবে ঘুরলে মাথা ঘুরবে না? থামবি?”

গাববু বলল, “এই তো থামছি আম্মু। আর এক সেকেন্ড!”

গাববু তখন তখনই থামল না, আরও কিছুক্ষণ পাক খেল। তারপর ঘুরতে ঘুরতে বসার জন্যে এগিয়ে এল। টুনির চেয়ারে ধাক্কা খেল, মিঠুর চেয়ারটা ধরে তাল সামলিয়ে কোনোমতে নিজের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ল। গাববুর মনে হতে থাকে তার সামনে সবকিছু ঘুরছে, তার সাথে সাথে

সে নিজেও ঘুরছে। মনে হতে থাকে সে এক্ষুনি বুঝি উল্টে পড়ে যাবে, তাই সে শক্ত করে টেবিলটা ধরে রাখল যেন তারা পড়ে না যায়। গাববু চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল, সবাইকে ঝাপসা ঝাপসা দেখাচ্ছে, আস্তে আস্তে সবাই স্পষ্ট হতে শুরু করল।

সবাই গাববুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল, মাথায় উষ্ণখুষ্ণ ঢুল, চোখে বড় ফ্রেমের চশমা, চরকির মতো ঘোরার কারণে মুখে লালচে আভা, নাকের ওপর বিন্দু বিন্দু ঘাম। আববু গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, “গাববু, এখানে কী হচ্ছে বলবি?”

গাববু হাসি হাসি মুখে বলল, “একটা এক্সপেরিমেন্ট করলাম।”

“সেটা তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু কিসের এক্সপেরিমেন্ট?”

গাববু সবার দিকে তাকাল, তারপর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, “তোমরা মনে হয় বুঝবে না।”

গাববুর বয়স মাত্র বারো, কিন্তু এর মাঝেই তার চুলের ডগা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সে পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক। সেটি কোনো বড় সমস্যা হওয়ার কথা না, কিন্তু সে যেহেতু প্রতি মুহূর্তেই কোনো না কোনো বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করছে এবং তার বেশির ভাগ পরীক্ষার ধকলগুলো বাসার সবাইকে সহ্য করতে হচ্ছে, তাই বাসার সবারই “এক্সপেরিমেন্ট” শব্দটার সাথে একধরনের অ্যালার্জির মতো হয়ে গেছে। তাই যখন গাববু তার বৈজ্ঞানিক এক্সপেরিমেন্টের কথা সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করে অন্যেরা অনেক সময়ই তার গুরুত্বটা গাববুর মতো করে বুঝতে পারে না।

আববু মুখে গাম্ভীর্য ধরে রেখে বললেন, “চেষ্টা করে দেখ, বুঝতেও তো পারি।”

একটা বৈজ্ঞানিক বিষয় বোঝানোর সুযোগ পেয়ে এবারে গাববুর চোখ-মুখ ঝলমল করে ওঠে, সে চোখ বড় বড় করে বলল, “তোমরা সবাই নিশ্চয়ই ভাবো যে, কান দিয়ে আমরা শুধু শুনি। এটা সত্যি না।”

মিঠুর বয়স আট, এই বাসায় শুধু মিঠুই এখনো গাববুর বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে মাঝে মাঝে একটু উৎসাহ ধরে রাখতে পেরেছে। সে চোখ বড় বড় করে বলল, “আমরা কান দিয়ে দেখি?”

“ধুর গাধা! কান দিয়ে আবার দেখব কেমন করে?”

“তাহলে?”

“কানের ভেতরে ছোট ছোট টিউবের মাঝে একরকম তরল পদার্থ আছে। সেটা ব্রেনের মাঝে সিগন্যাল পাঠায়, সেই সিগন্যাল দিয়ে ব্রেন বুঝতে পারে আমি কোথায় আছি, তাই আমরা পড়ে যাই না। সেই জন্য কেউ যদি ঘোরে তাহলে কানের ভেতরে ছোট ছোট টিউবের মাঝে যে তরল পদার্থ আছে সেটা ওলট পালট হয়ে যায়। তখন আর ব্যালেন্স থাকে না-মাথা ঘোরায়া।”

সবাই একধরনের অবিশ্বাসের ভঙ্গি করে গাববুর দিকে তাকিয়ে রইল, গাববু বলল, “তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করলে না? ঘুরে দেখো। ঘুরে দেখো আমার মতো।”

আম্মু বললেন, “অনেক হয়েছে। বাসায় একজন পাগল আছে সেইটাই বেশি। এখন সবাই মিলে পাগল হতে হবে না।”

গাববু বলল, “পাগল? পাগল কেন হবে? তুমি আসো তোমাকে দেখাই আম্মু! খুব সোজা এক্সপেরিমেন্ট।” গাববু আম্মুকে ঘোরানোর জন্যে ওঠে দাড়াল।

আম্মু মাথা নেড়ে বললেন, “ব্যস! অনেক হয়েছে। তোর এক্সপেরিমেন্টের জ্বালায় আমাদের জীবন শেষ।”

টুনি টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, “কী বলছ আম্মু তোমাদের জীবন শেষ? তোমাদের জীবন কেন শেষ হবে? জীবন যদি শেষ হয় তাহলে সেটা হচ্ছে আমার!”

টুনি গাববু থেকে দুই বছরের বড়। এই বাসায় গাববুর সাথে সবচেয়ে বেশি ঝামেলা হয় টুনির। সে ছিমছাম শান্তশিষ্ট মেয়ে, তার সবকিছু নিয়মমাফিক, সাজানো গোছানো। গাববু হচ্ছে ঠিক তার উল্টো। টুনির সব নিয়মকানুন সাজানো গোছানো ছিমছাম জীবন গাববুর কারণে ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে। টুনি বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, “গাববু কী করে তোমরা তার কিছুই টের পাও না। টের পাই আমি।” বুকে থাবা দিয়ে বলল, “আমি।”

মিঠু পাশে বসে থেকে সমান উৎসাহে বলল, “আর আমি।”

গাববু মুখ শক্ত করে বলল, “কেন? আমি কী করেছি?”

টুনি বলল, “তুই কী করিস নি? সেইদিন তুই একটা এত বড় গোবদা কোলা ব্যাঙ ঘরের ভেতর নিয়ে আসিসনি? বিছানার নিচে তুই গামলা গামলা পচা জিনিস রেখে দিসনি?”

মিঠু সমান উৎসাহে যোগ দিল, “আমার রিমোট কন্ট্রোল গাড়িটা তুমি নষ্ট করে দাওনি? এখন সামনে পিছে যায় না-শুধু এক জায়গায় ঘোরে।”

টুনি টেবিলে থাবা দিয়ে বলল, “আমার মোবাইল ফোনটা তুই নষ্ট করিস নি? ক্যালকুলেটরের বারোটা বাজিয়ে দিস নি?”

গাববু হালকা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে টুনির দিকে তাকিয়ে রইল। টুনি আর মিঠু যে কথাগুলো বলছে সেগুলো সত্যি, কিন্তু সেগুলো কেন অভিযোগ করার মতো বিষয় সেটা সে বুঝতে পারছে না। কয়েকদিন আগে সন্কেবেলা বাসায় আসার সময় সে দেখে বিশাল একটা কোলা ব্যাঙ লাইটপোস্টের নিচে বসে মহানন্দে লাইটপোস্টের নিচে পড়ে থাকা পোকা খাচ্ছে। গাববুকে দেখে সেই কোলা ব্যাঙ লাফ দিয়ে সরে যাওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু গাববু তাকে ধরে ফেলল। বিশাল সেই কোলা ব্যাঙ তার

হাত থেকে পিছলে বের হওয়ার চেষ্টা করল, কিন্তু গাববু ছাড়ল না, বাসায় নিয়ে এল। ব্যাঙটাকে দেখে টুনি লাফিয়ে নিজের বিছানায় উঠে আতঙ্কে চিৎকার করতে থাকে। গাববু অবাক হয়ে বলল, “কী হয়েছে?”

“তুই হাত দিয়ে এত বড় ব্যাঙ ধরে রেখেছিস কেন?”

“পালবা।”

“পালবি? কোথায় পালবি?”

“কেন, আমার ঘরে।” বলে সে ব্যাঙটাকে ছেড়ে দিল আর ব্যাঙটা ছাড়া পেয়ে কয়েক লাফ দিয়ে বিছানার নিচে ঢুকে গেল।

টুনি চিৎকার করে বলতে লাগল, “এক্ষুনি ব্যাঙটাকে বাইরে ফেলে দিয়ে আয়, বাইরে ছেড়ে দিয়ে আয় বলছি। না-হলে তোকে খুন করে ফেলব।”

গাববু কিছুতেই বুঝতে পারল না, কেন একটা ব্যাঙের জন্যে তাকে খুন করে ফেলা হবে। সে দুর্বলভাবে চেষ্টা করল, “আপু, ব্যাঙ খুবই শান্তশিষ্ট। এটা বিছানার নিচে থাকবে, পোকামাকড় খাবে। তুমি তো তেলাপোকাকে খুব ঘেন্না কর, এখন এই ঘরে কোনো তেলাপোকা আসতেই পারবে না। আমার ব্যাঙটা খপ করে খেয়ে ফেলবে।”

টুনি বলল, “তেলাপোকা খাওয়ার জন্যে আমার কোনো সাপ ব্যাঙের দরকার নাই।”

গাববু বলল, “আপু, কুনো ব্যাঙের চোখের নিচে বিষাক্ত গ্ল্যান্ড থাকে। এটা কুনো ব্যাঙ না, এটা কোলা ব্যাঙ। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন-”

টুনি চিৎকার করে বলল, “চাই না আমার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ব্যাঙ-”

চৈচামেচি শুনে আববু আশ্মু মিঠু সবাই চলে এল, গাববু অবাক হয়ে দেখল, বাসায় সবাই টুনির পক্ষে, কেউই তার পক্ষে নেই একটা কোলা ব্যাঙ পোষার পক্ষের যুক্তিটা কেউ দেখতে পেল না। গাববু তখন খুবই মন খারাপ করে বিছানার নিচে গিয়ে ব্যাঙটাকে ধরে আবার লাইটপোস্টের নিচে ছেড়ে দিয়ে এল। সে এখনো বুঝতে পারে না, কেন তার বাসায় আসার পর সাবান দিয়ে গোসল করতে হল।

বিছানার নিচে গামলা গামলা পচা জিনিস রেখে দেওয়ার কথাটা অবশ্যই অতিরঞ্জন। সে মোটেও গামলা গামলা পচা জিনিস রাখে নি, মাত্র দুটো প্লেটে ময়দা দিয়ে তৈরি লেই রেখে দিয়েছিল। একটার মাঝখানে সে একটু থুথু ফেলেছে, অন্যটা পরিষ্কার। তারপর দুটাই প্লাস্টিক দিয়ে ভালো করে ঢেকে বিছানার নিচে রেখে দিয়েছে। মানুষের মুখের মাঝে লক্ষ লক্ষ ব্যাক্টেরিয়া থাকে, তাই থুথুর সাথে সেই ব্যাক্টেরিয়া ময়দার তৈরি লেইয়ের মাঝখানে জায়গা নিয়েছে। আস্তে আস্তে সেই ব্যাক্টেরিয়াগুলো

বাচ্চাকাচ্চা দিয়েছে, নাতিপুতি দিয়েছে। সেই নাতিপুতিদের আবার নাতিপতি হয়েছে। প্লেটের মাঝে ব্যাক্টেরিয়াদের কী বিচিত্র কলোনি! গাববু প্রতিদিন মুগ্ধ হয়ে সেগুলো দেখে-সেখান থেকে ধীরে ধীরে একটা পচা গন্ধ বের হতে শুরু করেছে, কিন্তু সেটা তো হওয়ারই কথা। কে শুনেছে ব্যাক্টেরিয়ার কলোনি থেকে মিষ্টি গন্ধ বের হয়?

সপ্তাহখানেক যাওয়ার পর টুনি শুধু নাক কুঁচকে গন্ধ নেয় আর বলে, “ঘরের মাঝে পচা গন্ধ কিসের?” গাববু না-শোনার ভান করে। শেষে একদিন টুনি খোঁজা শুরু করল আর সত্যি সত্যি বিছানার নিচে দুটো থালা পেয়ে গেল। একটার মাঝে বিশাল ব্যাক্টেরিয়ার কলোনি, সেখানে কী চমৎকার রঙ, কী বিচিত্রভাবে সেটা বেড়ে উঠছে, অন্যটাতে কী সুন্দর ফাংগাস! গাববু অবাক হয়ে আবিষ্কার করল, টুনি এই অসাধারণ সৌন্দর্যের কিছুই লক্ষ করল না, নাক চেপে ধরে প্রায় বমি করে দেয় সে রকম ভঙ্গী করতে থাকে। চিৎকার করে সে সারা বাসা মাথায় তুলে ফেলল। আববু আস্মু এসেও টুনির পক্ষ নিলেন, আর গাববুর এত চমৎকার ব্যাক্টেরিয়া কলোনি টয়লেটে ফ্লাশ করে দেওয়া হল। কী দুঃখের ব্যাপার!

মিঠুর রিমোট কন্ট্রোল গাড়িটা যে এক জায়গায় ঘোরে সেটা সত্যি, কিন্তু এখন সেটাই তো করার কথা। গাববু প্রথমে গাড়িটা খুলে ভেতরে কী আছে দেখেছে, যে মোটরটা চাকাগুলোকে ঘোরায় সেই মোটরের কানেকশনগুলো উল্টে দিয়ে দেখার চেষ্টা করেছিল গাড়িটার যখন সামনে যাওয়ার কথা তখন পেছনে আর যখন পেছনে যাওয়ার কথা তখন সামনে যায় কিনা। যখন গাড়িটার সবগুলো স্ক্রু লাগানোর চেষ্টা করল তখন অবাক হয়ে লক্ষ করল তার কাছে দুটা স্ক্রু বেশি। কী আশ্চর্য-এই দুটা বাড়তি স্ক্রু কোথা থেকে এসেছে সে বুঝতেই পারল না। গাড়িটা নাড়ালে অবশ্যি ভেতরে কিছু একটা খটর-মটর করে নড়ে, মনে হচ্ছে সেটা ঠিক করে লাগে নি। কাজেই গাববু আবার গাড়িটা খুলে ফেলল। পুরোটা ঠিক করে লাগানোর পর এবারে গাববু অবাক হয়ে লক্ষ করল এবার তিনটা স্ক্রু বেঁচে গেছে। গাড়িটার ভেতর খটর-মটর শব্দটা নেই, কিন্তু নতুন ঠুন ঠুন একধরনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। সে আবার খুলে ঠিক করে ফেলতে চাইছিল, কিন্তু মিঠু চিৎকার করে বাসা মাথায় তুলে ফেলল। তাই গাববু আর ঠিক করতে পারল না, এখন গাড়িটা বাঁকা হয়ে ঘুরপাক খেতে থাকে। গাববুকে যে গাড়িটা ঠিক করতে দেয় নি সেটা তো আর তার দোষ হতে পারে না।

মোবাইল ফোন আর ক্যালকুলেটরের বিষয়টা একটু জটিল। সে বইয়ে পড়েছে লিকুইড ক্রিস্টাল ডিসপ্লে মাঝে পোলারাইজার থাকে, একটা পোলারাইজার ব্যবহার করার তার অনেকদিনের শখ। ক্যালকুলেটর খুলে সে একটুকরো প্লাস্টিকের মতো জিনিস বের করেছে, সেটা পোলারাইজার কি না তা বোঝার জন্যে তার আরেকটা পোলারাইজার দরকার। গাববু ভাবছিল হয়তো টুনির মোবাইলের

ওপরে একটা পোলারাইজার থাকতে পারে। সেটা যখন খোলার চেষ্টা করছে ঠিক তখন টুনি এসে হাজির, সাথে সাথে চিৎকার চঁচামেচি হইচই! গাববুকে বিষয়টা ব্যাখ্যা করারই সুযোগ দিল না।

আজকে খাবার টেবিলে সবার সামনে আলোচনাটা শুরু হয়ে একদিক দিয়ে ভালোই হল, যে কথাগুলো গাববু আগে বলতে পারেনি এখন সেটা বলা যাবে। কাজেই সে গলা পরিষ্কার করে বলা শুরু করল, “আপু, তুমি যেগুলো বলেছ সেগুলো সত্যি না। আসলে হয়েছে কী-”

আম্মু তখন ভাতের চামচ দিয়ে টেবিলে ঠকাস করে মেরে বললেন, “ব্যস! অনেক হয়েছে। দিনরাত শুধু ঝগড়া আর ঝগড়া। তোরা কি কখনো মিলে মিশে থাকতে পারবি না?”

গাববু বলল, “আম্মু, আমি মোটেই ঝগড়া করছি না।”

আম্মু গলা উঁচিয়ে বললেন, “আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। মুখ বন্ধ করে খা-”

এরকম একটা অবৈজ্ঞানিক কথা, গাববু প্রতিবাদ না করে পারল না, মুখ বন্ধ করে মানুষ কেমন করে থাকে? সে বলল, “আম্মু, মুখ বন্ধ করে খাওয়া অসম্ভব। ইন্টার ভেনাস-”

আম্মু টেবিলে থাবা দিয়ে বললেন, “আর একটাও কথা না!”

কাজেই সবাই চুপ করে খেতে শুরু করল। গাববু আজকেই জেনেছে কেমন করে লবণের মাঝে আয়োডিন আছে কি নেই সেটা পরীক্ষা করা যায়। এর জন্যে দরকার কয়েকটা ভাত, একটুকরো লেবু আর একটুখানি লবণ। টেবিলের ওপর সবকিছু আছে, গাববু চাইলেই সেই এক্সপেরিমেন্টটা করতে পারে, কিন্তু এখন সাহস করল না। তার বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে টুনি এত কিছু বলেছে, মিঠুও নালিশ করেছে, তার মাঝে এফুনি যদি সে আবার এক্সপেরিমেন্টটা করা শুরু করে তাহলে তার ওপর দিয়ে শুধু ঝড় না, সাইক্লোন শুরু হয়ে যেতে পারে।

কিছুক্ষণের মাঝেই আববু আর আম্মু পলিটিক্স নিয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। ভাগ্যিস দেশে মন্ত্রী-মিনিস্টাররা প্রত্যেকদিনই কিছু না কিছু অঘটন করছে, পলিটিশিয়ানরা ঝগড়াঝাটি করছে। তাই আববু-আম্মুদের মতো বড় মানুষদের আলাপ করার একটা বিষয় আছে, তা না হলে তারা কী নিয়ে আলাপ করতেন কে জানে! যখন গাববু দেখল তার দিকে আর কেউ নজর দিচ্ছে না তখন সে তার প্লেটের কোনায় কয়েকটা ভাত নিয়ে তার মাঝে লেবুর টুকরো থেকে চিপে লেবুর রস ফোঁটা ফোঁটা করে মিশিয়ে দিল, তারপর সেখানে খানিকটা লবণ দিয়ে পুরোটো আচ্ছা করে কচলে নিতে শুরু করে। গাববু ভাবছিল, সে কী করছে কেউ খেয়াল করবে না, কিন্তু মিঠু ঠিকই দেখে ফেলল, আর চিৎকার করে বলল, “ভাইয়া এক্সপেরিমেন্ট করছে, ভাইয়া আবার এক্সপেরিমেন্ট করছে!”

সবাই তখন ঘুরে গাববুর দিকে তাকাল। গাববু ইতস্তত করে বলল, “আমি মোটেও এক্সপেরিমেন্ট করছি না। আমি একটা দরকারি জিনিস পরীক্ষা করে দেখছি।”

আববু জানতে চাইলেন, “কী জিনিস?”

“লবণে আয়োডিন আছে কি না। আয়োডিন ছাড়া লবণ খেলে গলগন্ড রোগ হয়।”

মিঠু জানতে চাইল, “গলগন্ড রোগ কী?”

আববু বললেন, “গলা ফুলে যাওয়ার একরকম রোগ।”

টুনি জিজ্ঞেস করল, “কী দেখলি? লবণে আয়োডিন আছে?”

গাববু বলল, “যদি এই লবণটা বেগুনি হয়ে যায় তাহলে বুঝবে লবণে আয়োডিন আছে।”

সবাই তখন গাববুর প্লেটের কোনায় তাকাল, প্রথমে কিছু হল না, তারপর হঠাৎ করে লবণটুকু ঠিক বেগুনি না হয়ে নীল হয়ে গেল। আববু মাথা নাড়লেন, বললেন, “গাববু তো ঠিকই বলেছে। লবণটা তো দেখি আসলেই বেগুনির মতো হয়ে গেল।”

মিঠু চোখ বড় বড় করে বলল, “ভাইয়া, তুমি হচ্ছে সায়েন্টিস্ট।”

গাববু মাথা নাড়ল, বলল, “উঁহু। আমি এখনো সায়েন্টিস্ট হই নাই। আমি বড় হলে সায়েন্টিস্ট হতে চাই।”

টুনি বলল, “তুই এখনো সায়েন্টিস্ট হোস নাই তাতেই আমাদের বাসার সবার জীবন শেষ। যখন তুই সায়েন্টিস্ট হবি তখন কী অবস্থা হবে চিন্তা করতে পারিস? তখন শুধু বাসার না, সারা দেশের সব মানুষের জীবন নষ্ট করে দিবি।”

গাববু মুখ শক্ত করে বলল, “কক্ষনো না। সায়েন্টিস্টরা কক্ষনো মানুষের জীবন নষ্ট করে না।”

“তুই করিস।”

“করি না।”

টুনি জোর গলায় কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিল, আববু থামিয়ে দিলেন, বললেন, “ব্যস, ব্যস। অনেক হয়েছে। এখন থাম। তোদের জ্বালায় শান্তিমতো খেতেও পারি না।”

কাজেই টুনি আর গাববুর সবাইকে শান্তিতে খেতে দেওয়ার জন্যে চুপ করে যেতে হল। আববু আর আম্মু আবার খানিকক্ষণ পলিটিক্স নিয়ে কথা বললেন, তারপর গ্লোবাল ওয়ার্মিং নিয়ে কথা বললেন, তারপর ইউরোপ আমেরিকা নিয়ে কথা বললেন, তখন টুনি বলল, “জানো আম্মু, মিথিলা আমেরিকা থেকে একটা ভিউকার্ড পাঠিয়েছে। কী সুন্দর ভিউকার্ড।”

মিথিলা ওদের ফুপাতো বোন, ফুপার বিশাল গার্মেন্টসের ব্যবসা। ভীষণ বড় লোক, ছুটিছাটাতে তারা ইউরোপ আমেরিকা বেড়াতে চলে যায়। আম্মু জিজ্ঞেস করলেন, “কী লিখেছে মিথিলা?”

“এই তো, কত মজা করছে এইসব।”

মিঠু জানতে চাইল, “কার্ডে কিসের ছবি আপু?”

“নায়েগ্রা ফলসের।”

“নায়েগ্রা ফলস কী?”

“অনেক বড় একটা জলপ্রপাত।”

“ছবিটা দেখাবে আপু?”

“আমার টেবিলের ওপর ভিউকার্ডটা আছে। দেখে নিস।”

মিঠুর অবশ্যি দেরি সহ্য হল না, তখন তখনই উঠে গিয়ে কার্ডটা নিয়ে এল। সবাই ছবিটা দেখল, টুনি কার্ডের উল্টোপিঠের চিঠিটা একনজর দেখে বলল, “মিথিলা চিঠিতে আরেকটা ইন্টারেস্টিং জিনিস লিখেছে।”

আম্মু জিজ্ঞেস করলেন, “কী?”

টুনি পড়ে শোনাল, “তুই কী জানিস আমেরিকাতে বাংলাদেশের একজন বৈজ্ঞানিককে নিয়ে অনেক হইচই হচ্ছে?”

“রিফাত হাসান!” আববু মাথা নাড়লেন, “আমি পত্রিকায় পড়েছি, কী একটা জিনিস জানি আবিষ্কার করেছেন।”

টুনি গাববুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “গাববু, তুই জানিস?”

গাববু কার্ডটার দিকে তাকিয়ে ছিল, বাতাসের চাপের একটা এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য তার ঠিক এই সাইজের একটা কার্ড দরকার। কী নিয়ে কথা হচ্ছিল সে খেয়াল করেনি। অন্যমনস্কভাবে মাথা নেড়ে বলল, “আপু, তোমার এই কার্ডটা আমাকে দেবে?”

টুনি ধরেই নিল নায়েগ্রা ফলসের সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গাববু কার্ডটা চাইছে, তাই সে গাববুকে কার্ডটা দিয়ে দিল। কোনোকিছুর সৌন্দর্য নিয়ে গাববুর কোনো উৎসাহ আছে বলে বাসার কেউ জানে না।

গাববু দ্রুত খাওয়া শেষ করে পানি খেল, তারপর জগ থেকে পানি ঢেলে গ্লাসটাকে কানায় কানায় ভরে নিল। আম্মু ভুরু কুঁচকে বললেন, “কী হচ্ছে গাববু? গ্লাসে এত পানি ভরছিস কেন? পানি খাবি কেমন করে?”

গাববু বলল, “পানি খাব না।”

“তাহলে?”

মিঠু বুঝে গেল, হাততালি দিয়ে বলল, “এক্সপেরিমেন্ট! ভাইয়ার আরেকটা এক্সপেরিমেন্ট! তাই না ভাইয়া?”

গাববু মাথা নাড়ল, বলল, “এটা খুবই সোজা এক্সপেরিমেন্ট। এই দেখা।”

গাববু কানায় কানায় ভরা গ্লাসটার ওপর ভিউকার্ডটা রাখতেই টুনি চিৎকার করে বলল, “তুই ভিউকার্ডটা নষ্ট করছিস কেন?”

গাববু বলল, “তুমি এই কার্ডটা আমাকে দিয়ে দিয়েছ। এখন এটা আমার-আমি এটা দিয়ে যা ইচ্ছা তাই করতে পারি।”

“তাই বলে নষ্ট করবি?”

গাববু কোনো উত্তর না দিয়ে গ্লাসটাকে উপড় করে ফেলল, ভিউকার্ডটা থেকে হাত সরিয়ে ফেলার পরও পানিটা গ্লাসে আটকে রইল, পড়ে গেল না। মিঠু আনন্দে চিৎকার করে বলল, “এক্সপেরিমেন্ট! সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট।”

গাববু রাজ্য জয় করে ফেলার মতো একটা ভঙ্গি করে সবার দিকে তাকিয়ে বলল, “দেখেছ, পানির চাপ কীভাবে পানিটাকে আটকে রেখেছে!”

মিঠু হাততালি দিয়ে বলল, “সায়েন্টিস্ট! ভাইয়া হচ্ছে সায়েন্টিস্ট!”

আম্মু ভয়ে ভয়ে বললেন, “ঠিক আছে। এক্সপেরিমেন্ট তো হয়েছে, এখন গ্লাসটা সোজা করে ফেল। হঠাৎ করে যদি পানি পড়ে যায় কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।”

গাববু কঠিন মুখ করে বলল, “কখনো পড়বে না আম্মু। কখনো পড়বে না। তুমি সায়েন্সকে বিশ্বাস কর না? বাতাসের একটা চাপ আছে না? এই চাপ পানিটাকে আটকে রেখেছে। এইটা তো ছোট একটা গ্লাস-এই গ্লাসটা যদি তিরিশ ফুট লম্বা হতো তাহলেও আটকে রাখতে পারত।”

আববু বললেন, “ঠিক আছে গাববু। আমরা বিশ্বাস করে ফেললাম। এখন এক্সপেরিমেন্ট শেষ করে ফেল। দেখে ভয় লাগছে।”

গাববু বলল, “কোনো ভয় নাই। যতক্ষণ পৃথিবীতে বাতাস আছে ততক্ষণ বাতাসের চাপ আছে, আর যতক্ষণ বাতাসের চাপ আছে ততক্ষণ কোনো ভয় নাই। এই দেখো-”

বলে গাববু উল্টো করে ধরে রাখা পানিভর্তি গ্লাসটাকে রীতিমতো একটা ঝাঁকুনি দিল এবং সত্যি সত্যি কিছুই হল না। গাববু বিজয়ীর মতো সবার দিকে তাকাল এবং ঠিক তখন কথা নাই বার্তা নাই হঠাৎ ঝপাৎ করে পুরো গ্লাসের পানি টেবিলের ওপর পড়ে গেল। টেবিল থেকে পানি মাছের ঝোলের সাথে মিশে ছিটকে এসে সবার চোখে মুখে গায়ে এসে লাগে। বাড়তি কিছু পানি টেবিল থেকে গড়িয়ে টুনির কোলে এসে পড়ল, বাকিটুকু গড়িয়ে আববুর দিকে যাচ্ছিল, আববু লাফিয়ে সরে গেলেন।

মিঠু শুধু আনন্দে চিৎকার করতে থাকে, “এক্সপেরিমেন্ট! সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট!”

টুনি চিৎকার করে লাফিয়ে কুঁদিয়ে একটা বিশাল হইচই শুরু করে দিল, “আববু আম্মু তোমরা দেখেছ? দেখেছ? দেখেছ গাববু কী করল? আমার এত সুন্দর টি-শার্টটা দিল বারোটা বাজিয়ে। তোমরা

কিছু বল না দেখে গাবুটা এত সাহস পেয়েছে। দিন নাই রাত নাই খালি এক্সপেরিমেন্ট আর এক্সপেরিমেন্ট।”

আববু হতাশভাবে মাথা নাড়লেন, আম্মু টেবিলের থই থই পানি, মাছের ঝোল আর ডাল পরিষ্কার করতে লাগলেন, শুধু মিঠু আনন্দে চিৎকার করতে লাগল, “এক্সপেরিমেন্ট। সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট!”

সোফায় বসে চা খেতে খেতে আববু টেলিভিশন দেখছিলেন-অবশ্যি দেখছিলেন বললে কথাটা ভুল বলা হবে, ঠিক করে বলা উচিত, একটার পর একটা চ্যানেল পাণ্টে যাচ্ছিলেন। বিদঘুটে গান, বাংলা সিনেমা, হিন্দি সিরিয়াল আর কয়েকটা মোবাইল ফোনের বিজ্ঞাপন দেখে বিরক্ত হয়ে টেলিভিশনটা বন্ধ করে দিচ্ছিলেন, তখন হঠাৎ করে একটা চ্যানেলে খবর পেয়ে গেলেন। আববু খুব খবর শুনতে পছন্দ করেন, তাই খুব মনোযোগ দিয়ে খুটিয়ে খুটিয়ে খবর শুনতে লাগলেন।

প্রথমে রাস্তায় শ্রমিকদের সাথে পুলিশদের একটা দুর্ধর্ষ মারপিটের দৃশ্য দেখাল, না বলে দিলে এটাকে সিনেমার একটা দৃশ্য বলে মনে হতো। তারপর একটা কাগজের গোড়াউন পুড়ে যাওয়ার খবর দেখাল, দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে সেই দৃশ্যটি দেখানোর সময় সাংবাদিকের চোখমুখ আনন্দে ঝলমল করছিল যেন আগুনে কিছু পুড়ে যাওয়া খুব মজার ব্যাপার। তারপর একটা বাস দুর্ঘটনার খবর শোনাল, খবরের পর সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ে অণ্টেলটাইপের কিছু মানুষের প্যানপ্যানানি অনেকক্ষণ ধরে শুনতে হল। তারপর টেলিভিশনে সেজেগুজে থাকা মেয়েটা একটু ন্যাকা ন্যাকা গলায় বলতে শুরু করল, “যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী প্রফেসর রিফাত হাসান তিন দিনের সফরে আজকে বাংলাদেশে পৌঁছেছেন। এয়ারপোর্ট থেকে আমাদের সংবাদদাতার বিশেষ রিপোর্ট ...”

আববু তখন টেলিভিশনের ভলিউম বাড়িয়ে গলা উঁচিয়ে বললেন, “এই তোরা দেখে যা। বাংলাদেশী সায়েন্টিস্টকে দেখাচ্ছে।”

টুনি আর মিঠু দেখার জন্যে ছুটে এল, গাববু বেশি গা করল না। বিজ্ঞান নিয়ে তার অনেক আগ্রহে, বিজ্ঞানী নিয়ে বেশি মাথা ব্যথা নেই। তাছাড়া কোনো এক জায়গায় সে পড়েছে টেলিভিশন দেখলে মানুষের সৃজনশীলতা কমে যায়, তাই সে কখনো টেলিভিশন দেখে না।

দেখা গেল পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছরের একজন মানুষ এয়ারপোর্টের করিডর ধরে হেঁটে আসছেন এবং অনেক সাংবাদিক তাকে হেঁকে ধরেছে। মানুষটাকে কেমন জানি বিভ্রান্ত মনে হচ্ছে, সাংবাদিকদের কথা শুনে যেন বুঝতে পারছেন না কী বলতে হবে। আববু ভলিউমটা আরও একটু বাড়িয়ে দিলেন, সবাই কান পেতে শোনার চেষ্টা করল সাংবাদিকেরা কী প্রশ্ন করে আর বৈজ্ঞানিক রিফাত হাসান কী বলেন।

রিফাত হাসান এয়ারপোর্টে নেমে সত্যি সত্যিই একটু বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন। তিনি মোটেও আশা করেন নি এয়ারপোর্টে এতজন সাংবাদিক হাজির হবে। তাদের ক্যামেরার ফ্ল্যাশের আলোতে তাঁর চোখ রীতিমতো ধাঁধিয়ে গেল। তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্যে মন্ত্রণালয়ের যে জুনিয়র অফিসারটা এসেছে সে অনেক কষ্টে সাংবাদিকদের ঠেলে রিফাত হাসানের কাছে গিয়ে বলল, “স্যার আমি আপনাকে নিতে এসেছি। আপনার সাথে আমার ই-মেইলে যোগাযোগ হয়েছিল।”

রিফাত হাসান মনে হয় একটু ভরসা পেলেন, বললেন, “তুমি ইউসুফ?”

“জি স্যার।”

“থ্যাংক গড।” তারপর গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “এত সাংবাদিক কেন এসেছে?”

“আপনি স্যার একজন ইন্টারন্যাশনাল সেলিব্রিটি। সাংবাদিকেরা তো আসবেই।

“আমি আবার সেলিব্রিটি হলাম কবে থেকে?”

“কী বলেন স্যার! সারা পৃথিবী আপনাকে এখন এক নামে চেনে।”

“কে বলেছে? মোটেও সারা পৃথিবী চেনে না। আমি ইউনিভার্সিটির মাস্টার, অন্য মাস্টারদের সাথে যোগাযোগ আছে, সাধারণ পাবলিক আমাকে চিনবে কেন? সাধারণ পাবলিক চেনে ফিল্মস্টারদের। ফুটবল প্লেয়ারদের। তারা হচ্ছে সেলিব্রিটি।”

ইউসুফ মাথা নেড়ে বলল, “আমাদের দেশে আপনি হচ্ছেন আসল সেলিব্রিটি। ফেসবুকে আপনাকে নিয়ে কী হইচই হয় আপনি জানেন না?”

“উঁহু, জানি না।” রিফাত হাসান আরও কিছু-একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই সাংবাদিকেরা তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তেজী চেহারার একটা মেয়ে একেবারে তার মুখের কাছে মাইক্রোফোন ধরে বলল, “আপনি কতদিন পর দেশে এসেছেন?”

রিফাত হাসান কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই আরেকজন জিজ্ঞেস করল, “আপনি যে পার্টিকেল আবিষ্কার করেছেন তার নাম কী?” একই সাথে আরেকজন জিজ্ঞেস করল, “এই পার্টিকেলটাকে কী রিফাত পার্টিকেল ডাকবে?” তার প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই আরেকজন জিজ্ঞেস করল, “আপনি এখন কী নিয়ে গবেষণা করছেন?” সিরিয়াস ধরনের একজন কঠিন মুখে জিজ্ঞেস করল, “বাংলাদেশে কি বিজ্ঞানচর্চার সত্যিকারের সুযোগ আছে?” কমবয়সী একটা মেয়ে সবার গলাকে ছাপিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, “বৈশ্বিক উষ্ণায়নে বাংলাদেশ কতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে আপনি মনে করেন।”

রিফাত হাসান একেবারে হকচকিয়ে গেলেন, এতজন সাংবাদিকের এতগুলো প্রশ্ন, তিনি কোনটি ছেড়ে কোনটির উত্তর দেবেন? হাত তুলে বললেন, “আস্তে! আস্তে! সবাই একসাথে প্রশ্ন করলে তো আমি কারও প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারব না!”

কম বয়সী মেয়েটি গলা উঁচিয়ে বলল, “আপে আমার প্রশ্নের উত্তর দিন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন-”

তার গলা ছাপিয়ে আরেকজন জিজ্ঞেস করল, “আপনি কতদিন পর দেশে এসেছেন?”

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রশ্ন থেকে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সোজা, তাই রিফাত হাসান এই প্রশ্নটার উত্তর দিলেন, বললেন, “আঠার বছর।”

“এতদিন পর দেশে এসে আপনার কেমন লাগছে? আপনি কী কী পরিবর্তন দেখছেন?”

“আমি এখনো এয়ারপোর্ট থেকেই বের হতে পারি নি, তাই এখনো কিছুই দেখতে পারিনি। অনুমান করছি দেশের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ফর এক্সাম্পল, এই এয়ারপোর্টটাই অনেক বড় আর আধুনিক হয়েছে। নিশ্চয়ই দেশেও এরকম আরো অনেক পরিবর্তন হয়েছে।”

সবাইকে ঠেলে মুশকো জোয়ান টাইপের একজন সাংবাদিক সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, “আপনি কতদিন দেশে থাকবেন?”

রিফাত হাসান বললেন, “তিন দিন। আমি তিন দিনের জন্যে দেশে এসেছি।”

“মাত্র তিন দিন? আঠার বৎসর পরে এসে আপনি মাত্র তিন দিন থাকবেন?”

রিফাত হাসান একটু খতমত খেয়ে বললেন, “আমি আবার আসব। তখন আমি সময় নিয়ে আসব। আমি কথা দিচ্ছি এর পরের বার আসতে আমার আর আঠার বছর লাগবে না।”

তেজী চেহারার মেয়েটা বলল, “এই তিন দিন আপনার প্রোগ্রাম কী?”

“আমি বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে এসেছি, তাই বেশির ভাগ সময় দেব এই মন্ত্রণালয়ের সাথে। এ ছাড়াও আমি দেশের অধ্যাপক গবেষকদের সাথে কথা বলব। দুটি ইউনিভার্সিটিতে দুটি টক দিতে হবে-”

মুশকো জোয়ান সাংবাদিকটা কনুই দিয়ে অন্যদের ঠেলে পেছনে ফেলে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, “এই দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, বিজ্ঞান শিক্ষা এবং গবেষণা নিয়ে আপনার একটা কमेंট প্লিজ-”

রিফাত হাসান মাত্র এসেছেন, এ ধরনের বিষয় কিছুই জানেন না, কী বলবেন বুঝতে পারছিলেন না, তখন বিজ্ঞান মন্ত্রণালয়ের জুনিয়র অফিসার ইউসুফ তাঁকে রক্ষা করল। সে রিফাত হাসানের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, “এখন আপনারা স্যারকে যেতে দিন প্লিজ। স্যার অনেক লম্বা ফ্লাইটে এসেছেন, খুবই টায়ার্ড। হোটেলে গিয়ে স্যার রেস্ট নেবেন। কাল সকালে স্যারের জরুরি মিটিং।”

কম বয়সী মেয়েটি গলা উঁচিয়ে বলল, “একটা প্রশ্ন। খালি একটা প্রশ্ন-”

ইউসুফ মুখ কঠিন করে বলল, “না। কোনো প্রশ্ন না। এখন আর কোনো প্রশ্ন না। স্যার যখন সাংবাদিকদের ব্রিফিং করবেন তখন আপনারা আসবেন, যত খুশি প্রশ্ন করবেন। এখন স্যারকে যেতে দিন, প্লিজ।”

সাংবাদিকেরা রিফাত হাসানকে যেতে দেওয়ার কোনো লক্ষণ দেখাল না, তখন ইউসুফ সবাইকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে একটু জায়গা করে রিফাত হাসানকে নিয়ে এগুতে থাকে। সাংবাদিকেরা পেছনে থেকে ছুটতে থাকে, ছবি তুলতে থাকে। তার মাঝে কোনোভাবে রিফাত হাসান এয়ারপোর্টের সামনে রাখা গাড়িটাতে উঠে পড়লেন।

গাড়িটা ছেড়ে দেওয়ার পর রিফাত হাসান একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, “বাবারে বাবা! শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেলাম।”

ইউসুফ বলল, “না স্যার। পুরোপুরি ছাড়া পান নি। ওই দেখেন মোটর সাইকেলে করে পিছু পিছু আসছে।”

রিফাত হাসান তাকিয়ে দেখলেন সত্যি সত্যি একটা মোটরসাইকেলে করে দুজন সাংবাদিক গাড়ির পাশাপাশি যেতে যেতে চলন্ত গাড়ির ছবি তোলায় চেষ্টা করছে। রিফাত হাসান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাড়ির সিটে মাথা রাখলেন। সেভাবে খানিকক্ষণ জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে রিফাত হাসান বললেন, “আঠার বছরে দেশের কত পরিবর্তন হয়েছে। আমি কিছুই চিনতে পারছি না!”

ইউসুফ বলল, “আঠার বছর অনেক লম্বা সময় স্যার, এই সময়ে আসলেই অনেক পরিবর্তন হতে পারে।”

“তাই তো দেখছি। কত চওড়া রাস্তা, হাজার হাজার গাড়ি, বড় বড় বিল্ডিং, পুরো শহরটাকেই অচেনা লাগছে।”

“আমাদেরই অচেনা লাগে! আপনার তো লাগতেই পারে-কতদিন পরে এসেছেন।”

রিফাত হাসান কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, “আমার আরও আগে আসা উচিত ছিল। এতদিন পরে দেশে এলে দেশ মনে হয় অভিমান করে দূরে দূরে থাকে। অপরিচিতের মতো ভান করে।”

রিফাত হাসানের গলার স্বরে একটু দুঃখ দুঃখ ভাব ছিল, ইউসুফ তাঁর দিকে একবার তাকাল, কিছু বলল না। রিফাত হাসান অনেকটা কৈফিয়তের সুরে বললেন, “আসলে খুব ছেলেবেলায় আমার বাবা-মা মারা গেছেন-আমি বিদেশে চলে গেছি। আমার দুই ভাইবোন, তারাও বিদেশে, এখানে সে রকম ক্লোজ আত্মীয়স্বজনও নেই। তাই দেশের সাথে সে রকম সম্পর্ক ছিল না। কাজকর্মের এত চাপ, দেশে আসার সময়ও পাইনি।”

ইউসুফ বলল, “এতদিন পর দেশে এসেছেন-আপনার নিজের জন্যে কোনো সময়ই তো দেখছি না, মিটিংয়ের পর মিটিং।”

“হ্যাঁ। একটার পর একটা মিটিং, না হয় সেমিনার।”

“আলাদা কোনো কিছু করার প্ল্যান কি আছে স্যার?”

রিফাত হাসান মাথা নাড়লেন, বললেন, “নাহ সেরকম কোনো প্ল্যান নেই! শুধু ছেলেবেলায় যেখানে ছিলাম সময় পেলে সেই জায়গাটা একটু হয়তো দেখে আসতাম।”

“আপনাকে নিয়ে যাব স্যার।”

“তোমাকে নিতে হবে না। আমি নিজেই খুঁজে বের করে নেব।”

ইউসুফ হাসল, বলল, “পারবেন না স্যার। আপনি নিজে নিজে যেতে পারবেন না।”

“কেন পারব না?”

“সাংবাদিকদের উৎপাতে। আগামী তিন দিন সাংবাদিকেরা আপনাকে এক সেকেন্ডও একা থাকতে দেবে না। সারাক্ষণ আপনার পিছু পিছু লেগে থাকবে। এই দেখেন পেছনে একটা টিভি চ্যানেলের গাড়ি, সামনে আরেকটা। একটা মোটরসাইকেল তো আগেই দেখেছেন-এখন দেখেন দুই নম্বর মোটরসাইকেলও চলে এসেছে। আমি লিখে দিতে পারি এর মাঝে হোটেলে অনেকে পৌঁছে গেছে।”

রিফাত হাসানকে কেমন জানি আতঙ্কিত দেখায়। শুনলো গলায় বললেন, “কেন? আমার পেছনে কেন?”

ইউসুফ বলল, “কারণ আপনি শুধু সেলিব্রেটি না, আপনি হচ্ছেন ইন্টারন্যাশনাল সেলিব্রেটি। এই দেশে তো রোল মডেলের খুব অভাব, তাই যদি কোনোভাবে একজনকে পেয়ে যায়, তার আর ছাড়াছাড়ি নেই। এই দেশের সব মানুষ আপনার কাজকর্ম ফলো করছে। ফেসবুকে আপনার বিশাল বিশাল ফ্যান ক্লাব, পত্রিকায় প্রত্যেকদিন আপনার ওপর আর্টিকেল বের হচ্ছে!”

“কী বলছ তুমি?”

“আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না স্যার। আগামী তিন দিন আপনি এক সেকেন্ডও একা থাকতে পারবেন না। আমার মনে হচ্ছে পুলিশ প্রটেকশন ছাড়া আপনার বের হওয়া যাবে না।”

রিফাত হাসান শুনলো মুখে বললেন, “কী সর্বনাশ!”

ইউসুফ বলল, “আই অ্যাম সরি স্যার।”

হোটেলের পৌঁছানোর পর দেখা গেল ইউসুফের কথা সত্যি-বেশ কয়েকজন সাংবাদিক হোটেলের সামনে ভিড় করে আছে। গাড়ি থামতেই তারা ছুটে এল, কয়েকজন মাইক্রোফোন হাতে নিয়ে প্রশ্ন করার চেষ্টা করে, কিন্তু ইউসুফ কাউকে কোনো সুযোগ দিল না। রিফাত হাসানকে রীতিমতো টেনে হোটেলের ভেতরে ঢুকিয়ে ফেলল। হোটেলের গেটে দারোয়ান কোনো সাংবাদিককে ভেতরে ঢুকতে দিল না, রিফাত হাসান নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

৩

রাতে টুনি তার টেবিলে বই রেখে পড়ছে, হঠাৎ তার মনে হল কেউ তার ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছে, তাকিয়ে দেখে গাববু। টুনি ভুরু কুঁচকে বলল, “তুই কী করছিস?”

“দেখছি।”

“কী দেখছিস?”

“তোমার চুল।”

টুনির মাথার লম্বা চুল সত্যি দেখার মতো, তবে সেটা গাববুর চোখে পড়বে সেটা টুনি কখনো চিন্তা করে নি। সে বলল, “দেখা হয়েছে?”

“হ্যাঁ।”

“এখন যা। ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস ফেলবি না।”

গাববু বলল, “আপু, আমাকে একটা জিনিস দেবে?”

“কী জিনিস?”

“আগে বল, দেবে।”

“না জেনে কেমন করে বলব? আগে শুনি তারপর দেখি দেওয়া যায় কী না।”

মিঠু কাছেই ছিল, সে উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল, “আপু, তুমি রাজি হয়ো না, ভাইয়া সবসময় আজব আজব জিনিস চায়।”

গাববু মুখ শক্ত করে বলল, “আমি মোটেও আজব কোনো জিনিস চাই না।”

টুনি জিজ্ঞেস করল, “তাহলে কী চাস?”

“চুল।”

“চুল?” টুনি অবাক হয়ে বলল, “তুই চুল চাস?”

“হ্যাঁ।”

“তুই আমার কাছে চুল চাইছিস কেন? তোর নিজেরই তো মাথাভর্তি চুল।

গাববু বলল, “আমার লম্বা চুল দরকার। ছোট চুল দিয়ে হবে না। দেখছ না আমার চুল কত ছোট।
আববু আমাকে চুল লম্বা করতেই দেয় না।”

“কী করবি লম্বা চুল দিয়ে?”

“হাইথ্রোমিটার বানাব।”

“সেটা আবার কী জিনিস?”

“জলীয় বাষ্প মাপার মেশিন। বাতাসে জলীয় বাষ্প থাকলে চুল লম্বা হয়। তাই চুল দিয়ে একটা মেশিন বানাব। একটা রোলারের মতো জিনিসে চুল প্যাঁচানো থাকবে। চুল লম্বা হলে রোলারটা ঘুরবে। রোলারের সাথে একটা কাঁটা লাগানো থাকবে-” গাববু দুই হাত-পা নেড়ে তার যন্ত্র কীভাবে কাজ করবে সেটা বোঝানো শুরু করল, টুনি তখন তাকে থামাল, বলল, “ঠিক আছে, ঠিক আছে, বুঝেছি।”

“দেবে চুল?”

“তোর কতগুলো চুল লাগবে?”

গাববু বলল, “সবগুলো হলে ভালো হয়।”

টুনি তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলল, “কী বললি? সবগুলো? আমি তোকে চুল দেওয়ার জন্যে আমার মাথা ন্যাড়া করে ফেলব?”

গাববু বলল, “কেন? মানুষ কি মাথা ন্যাড়া করে না? আবার তো চুল উঠে যাবেই।”

টুনি রেগে বলল, “ভাগ এখান থেকে। পাজি কোথাকার! চং দেখে বাঁচি না। কত বড় শখ! তার মেশিন বানানোর জন্যে আমি আমার মাথা ন্যাড়া করে ফেলব!”

গাববু বলল, “ঠিক আছে, ঠিক আছে। সবগুলো দিতে না চাইলে অর্ধেক দাও।”

টুনি মুখ শক্ত করে বলল, “মাথার হাফ সাইড কামিয়ে অর্ধেক দেব? হাফ ন্যাড়া হাফ চুল?”

“হ্যাঁ। সমস্যা কী?”

“একজন মানুষের মাথার অর্ধেক ন্যাড়া আর অর্ধেক চুল থাকলে সেটা কী সমস্যা যদি তুই না বুঝিস তাহলে বুঝতে হবে তোর সিরিয়াস সমস্যা আছে। বুঝতে হবে তোর ব্রেনে গোলমাল আছে। বুঝেছিস?”

গাববু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “তার মানে তুমি দেবে না?”

“না।”

“একটুও দেবে না।”

“একটা দিতে পারি। জাস্ট ওয়ান।”

মিঠু এগিয়ে এসে বলল, “ভাইয়া নিয়ে নাও। আপু তোমাকে একটার বেশি দেবে না।”

গাববু টুনির মাথার লম্বা চুলগুলোর দিকে লোভ নিয়ে তাকিয়ে থেকে বলল, “তোমার মাথায় এত চুল, আর তুমি মাত্র একটা দেবে?”

টুনি মুখ খিঁচিয়ে বলল, “তুই যদি বেশি ঘ্যান ঘ্যান করিস তাহলে ওই একটাও পাবি না।”

মিঠু বলল, “ভাইয়া, বেশি ঘ্যান ঘ্যান না করে এই একটাই নিয়ে নাও। প্রত্যেকদিন একটা একটা করে নিলেই অনেকগুলো হয়ে যাবে।”

গাববু খুবই হতাশ ভঙ্গি করে বলল, “ঠিক আছে। তাহলে একটাই দাও।”

টুনি তার মাথার একটা চুল ছিঁড়ে দিতে যাচ্ছিল, গাববু তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, “দাঁড়াও, দাঁড়াও, তুমি ঠিক চুল দিতে পারবে না। আমি নাহুসনুহুস দেখে একটা বেছে নিই।”

গাববু দেখে শুনে একটা নাহুসনুহুস চুল হ্যাচকা টান দিয়ে ছিঁড়ে নিল, টুনি “আউ আউ” করে চিৎকার করে বলল, “বেশি নিয়ে যাস নি তো?”

গাববু মাথা নাড়ল, “না, বেশি নেই নাই।” তারপর একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, “আমি শুধু একটু বড় হয়ে নিই, তখন দেখ আমার এত বড় বড় চুল হবে। যখন দরকার হবে তখন পুট করে ছিঁড়ে নেব।”

মিঠু জানতে চাইল, “কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতন?”

গাববু মাথা নাড়ল, “উঁহ্। আইনস্টানের মতন। বৈজ্ঞানিকদের অন্যরকম লম্বা চুল থাকে।”

মিঠু মাথা নাড়ল, বলল, “না ভাইয়া, থাকে না। আজকে টেলিভিশনে বৈজ্ঞানিক রিফাত হাসানকে দেখিয়েছে, তার মাথায় মোটেও লম্বা চুল নাই।”

“তার মানে রিফাত হাসান হচ্ছে পাতি সায়েন্টিস্ট।”

টুনি বলল, “বাজে কথা বলবি না। এত বড় একজন সায়েন্টিস্টকে নিয়ে কী একটা বাজে কথা বলে দিল। ভাগ এখান থেকে। কানের কাছে আর ভ্যাদর ভ্যাদর করবি না। যা-”

গাববুর চোখ-মুখ হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বলল, “আপু তুমি কি জানতে চাও কেমন করে অল্প একটু পড়েই সব কিছু মনে রাখা যায়?”

টুনি বলল, “না, আমি জানতে চাই না। তুই বিদায় হা।”

“খুবই সহজ। ব্রেনের একটা অংশ আছে, তার নাম হচ্ছে এমিগডালা। এমিগডালার কাজ হচ্ছে-”

টুনি মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, “তুই চুপ করবি? করবি চুপ?”

গাববু হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, “ঠিক আছে বাবা-চুপ করছি।”

গভীর রাতে টুনির ঘুম ভেঙে গেল, তাকিয়ে দেখে ঘরে আলো জ্বলছে। ঘুরে গাববুর বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখল গাববু বিছানায় দুই পা তুলে বসে আছে। তার দুই চোখ বড় বড় করে খোলা এবং সে

ড্যাব ড্যাব করে শূন্যের দিকে তাকিয়ে আছে। টুনি ঘুম ঘুম চোখে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকাল-ঘড়িতে রাত একটা বেজে পাঁচ মিনিট। সে গাববুর দিকে তাকিয়ে বলল, “গাববু, রাত একটা বাজে। তুই এখনো ঘুমাসনি?”

গাববু মাথা নাড়ল, বলল, “না।”

“কী করছিস?”

“কিছু করছি না।”

“কিছু করছিস না তো জেগে বসে আছিস কেন?”

গাববু গম্ভীর মুখে বলল, “আমি একটা এক্সপেরিমেন্ট করছি।”

“এস্কুনি বললি কিছু করছিস না, এখন বলছিস এক্সপেরিমেন্ট করছিস। ব্যাপারটা কী?”

“এইটাই এক্সপেরিমেন্ট।”

“কোনটা?”

“জেগে বসে থাকা।”

টুনি দাঁত কিড়মিড় করে বলল, “জেগে বসে থাকা এক্সপেরিমেন্ট? আমার সাথে ফাজলেমি করিস?” তারপর ধমক দিয়ে বলল, “এস্কুনি লাইট নিভিয়ে শুয়ে পড়।”

গাববু মাথা নাড়ল, “উঁহ্। আমি জেগে থাকব।”

“জেগে থাকবি?”

“হ্যাঁ।”

“কেন?”

গাববু বলল, “কেউ যদি পরপর টানা তিন দিন না ঘুমিয়ে থাকতে পারে তাহলে তার হ্যালুসিনেশান শুরু হয়। হ্যালুসিনেশান বুঝেছ তো? অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস দেখা যায়-”

টুনি গরম হয়ে বলল, “রাত একটার সময় তোর আমাকে হ্যালুসিনেশান শিখাতে হবে না। আমি জানি হ্যালুসিনেশান কী!” সে বিছানায় উঠে বসে মেঘস্বরে বলল, “তুই যদি এস্কুনি লাইট নিভিয়ে ঘুমাতে না যাস তাহলে তোর আর হ্যালুসিনেশান দেখার জন্যে তিন রাত জেগে থাকতে হবে না। তুই এস্কুনি হ্যালুসিনেশান দেখা শুরু করবি।”

গাববু অবাক হয়ে বলল, “এস্কুনি? কিভাবে?”

“আমি উঠে এসে তোর চুলের ঝুঁটি ধরে এমন কয়েকটা ঝাঁকুনি দেব যে তোর ব্রেন তোর নাক দিয়ে বের হয়ে আসবে।”

এরকম একটা অবৈজ্ঞানিক কথা শুনে গাববু খুব বিরক্ত হল, বলল, “ব্রেন কখনো নাক দিয়ে বের হতে পারে না।”

টুনি চোখ পাকিয়ে বলল, “তুই দেখতে চাস বের হয় কি না? দেখাব এসে?” রীতিমতো হুঙ্কার দিয়ে বলল, “দেখাব?”

গাববু বলল, “না। দেখাতে হবে না।”

টুনি বরফের মতো ঠান্ডা গলায় বলল, “আমি এক থেকে দশ পর্যন্ত গুনব-এর মাঝে তুই যদি লাইট নিভিয়ে শুয়ে না পড়িস তাহলে তোর কপালে দুঃখ আছে।” টুনি গুনতে শুরু করল, “এক।”

গাববু বলল, “আপু, আমার কথা শোনো।”

টুনি গাববুর কথা শোনার জন্যে কোনো আগ্রহ দেখাল না, বলল, “দুই।”

“তুমি আগে শোনো আমি কী বলি।”

“তিন।”

গাববু মাথা নেড়ে বলল, “আপু, তোমার জন্যে আমি একটা কিছু করতে পারি না।”

টুনি বলল, “চার।”

“ইশ! আপু-”

“পাঁচ।”

গাববু এবারে হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, “ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি শুয়ে পড়ছি। খালি আমি একবার বড় হয়ে নিই, তখন দেখব তুমি কী করো।”

টুনি বলল, “ছয়।”

“গাববু বলল, তখন আমি তিন দিন না-সাত দিন না ঘুমিয়ে থাকব। তখন দেখব তুমি কী করো।”

টুনি বলল, “সাত।”

গাববু তখন লাইট নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল, টুনি শুনল, শুয়ে শুয়ে গাববু বিশাল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে।

ঠিক তখন রিফাত হাসানও তাঁর হোটেলের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। তার কারণটা অবশ্যি ভিন্ন, হঠাৎ করে তিনি টের পেয়েছেন এই দেশে তাঁর কোনো আপনজন নেই। পরিচিত মানুষ আছে, কিন্তু সত্যিকার অর্থে কোনো প্রিয়জন নেই। নিজের দেশে যদি একজনও প্রিয়জন না থাকে তাহলে তার মতো দুর্ভাগা কে হতে পারে?

রিফাত হাসান অবশ্যি তখনো জানেন না পরদিন তাঁর সাথে গাববু নামের বারো বছরের একটা ছেলের পরিচয় হবে এবং শুধু পরিচয়েই সেটা থেমে থাকবে না!

রিফাত হাসানও তাঁর হোটেল ঘরের বাতি নিভিয়ে শুয়ে পড়লেন, হোটেলের জানালা দিয়ে খানিকটা চাঁদের আলো তার বিছানায় এসে পড়ল।

৪

যে গাববুর পরপর তিন দিন তিন রাত না ঘুমিয়ে থাকার কথা ছিল, দেখা গেল ভোরবেলা তাকে কিছুতেই ঘুম থেকে তোলা যাচ্ছে না। আন্সু ডাকলেন, “এই গাববু, ওঠ, স্কুলে যেতে হবে না?”

গাববু বিড় বিড় করে কিছু-একটা বলে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে গেল। আন্সু আবার ডাকলেন, “ওঠ বলছি, ওঠ, দেরি হয়ে যাচ্ছে।”

গাববু বিড় বিড় করে আবার কিছু-একটা বলল, উঠল না। আন্সু এবার গাববুকে ধরে ঝাঁকুনি দিলেন, তখন সে চোখ খুলে তাকাল, ঘুম ঘুম গলায় বলল, “আন্সু, আর এক সেকেন্ড।” তারপর আবার ঘুমিয়ে গেল।

টুনি মাথা নেড়ে বলল, “আন্সু, তুমি গাববুকে তুলতে পারবে না। খামোখা চেষ্টা করো না।”

“কেন তুলতে পারব না?”

“গাববু সারা রাত জেগে বসে থাকে। কয়েক রাত না ঘুমিয়ে জেগে থাকলে নাকি হ্যালুসিনেশান হয়-গাববু সেই হ্যালুসিনেশান দেখবে।”

“কী বলিস? মাথা খারাপ দেখি!”

“হ্যাঁ আন্সু। তোমার এই ছেলের পুরোপুরি মাথা খারাপ। তুমি একে ঘুম থেকে তুলতে পারবে না।”

মিঠু কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, বলল, “আমি পারব।”

টুনি জিজ্ঞেস করল, “কীভাবে?”

“দেখবে? এই দেখো।” বলে কেউ কিছু বলার আগেই মিঠু টেবিলে রাখা পানির গ্লাসটা নিয়ে গ্লাসের পুরো পানিটা গাববুর শরীরের উপর ঢেলে দিল। গাববু তখন তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে চিৎকার করে ওঠে।

মিঠু বলল, “কিছু হয় নাই ভাইয়া। আমি তোমার শরীরে পানি ঢেলে দিয়েছি।”

গাববু মিঠুর দিকে তাকিয়ে চোখ পাকিয়ে বলল, “তুই তুই তুই...” কিন্তু বাক্যটা শেষ করতে পারল না।

মিঠুকে খুব বিচলিত হতে দেখা গেল না, সে হাসি হাসি মুখ করে বলল, “মনে নাই ভাইয়া তুমি আমাকে বলেছিলে শরীরের মাঝে নার্স না কী থাকে, ঠান্ডা কিংবা গরম লাগলে কী যেন কী হয়, ব্রেনের মাঝে কী যেন সিগন্যাল যায়-”

গাববুকে বিজ্ঞানের আলোচনাতেও খুব আগ্রহী হতে দেখা গেল না, নিজের ভিজা শরীরে হাত বুলিয়ে আবার বলল, “তুই তুই তুই ...।”

আম্মু বললেন, “ঠিক আছে, যা হওয়ার হয়েছে। এখন ওঠ। স্কুলে যেতে হবে।”

গাববু মুখ গোঁজ করে বলল, “আমি স্কুলে যেতে চাই না।”

আম্মু বললেন, “স্কুলে না গেলে কেমন করে হবে? ওঠ।”

গাববু খুব অনিচ্ছার সাথে বিছানা থেকে নামল। মিঠু গলা নামিয়ে টুনিকে বলল, “ভাইয়া তো সায়েন্টিস্ট। সায়েন্টিস্টদের সবসময় ঠান্ডা পানি দিয়ে তুলতে হয়।”

খাবার টেবিলে বসে সবাই নাস্তা করছে, হঠাৎ দেখা গেল গাববু তার দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে পানির গ্লাসে একটু দুধ ঢেলে নিল। মিঠু চিৎকার করে সবাইকে সতর্ক করে দিল, “দেখো দেখো, ভাইয়া আবার সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট করছে।”

আম্মু ভুরু কুঁচকে বললেন, “কী হচ্ছে গাববু? পানির গ্লাসে দুধ ঢালছিস কেন?”

গাববু দুধ মেশানো পানির গ্লাসটা হাতে নিয়ে বলল, “দুধ হচ্ছে কলয়েড। পানিতে যদি একটু দুধ মেশাও তাহলে পানিতে দুধের কণাগুলো ভাসতে থাকে।”

“তোর দুধের কণা পানিতে ভাসানোর কথা না, দুধ খাওয়ার কথা।”

গাববু আম্মুর কথা শুনল বলে মনে হল না, অনেকটা নিজের মনে বলল, “এখন যদি এই দুধ মেশানো পানির ভেতর দিয়ে সাদা আলো দেওয়া হয় তাহলে কী হবে জানো?”

মিঠু জানতে চাইল, “কী হবে?”

“সাদা আলোর নীল অংশটা বিচ্ছুরণ হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে। এর ভেতর দিয়ে যে আলোটা আসতে পারবে তার রং হবে লাল।”

মিঠু অবাক হয়ে বলল, “সত্যি?”

গাববু মাথা নাড়ল, বলল, “এক শ ভাগ সত্যি। এটার নাম র‍্যালে স্ক্যাটারিং। র‍্যালে স্ক্যাটারিংয়ের জন্যে সন্ধ্যাবেলা সূর্যকে লাল দেখায়, দিনের বেলা আকাশকে নীল দেখায়।”

মিঠু বলল, “সাদা আলো লাল করে দেখাও দেখি।”

গাববু এদিক সেদিক তাকিয়ে বলল, “সেটা দেখানোর জন্যে দরকার সাদা আলো। একটা ছোট আয়না দিয়ে রোদটাকে এর মাঝে ফেললে-”

আববু বললেন, “গাববু, তোকে এখন স্কুলে যেতে হবে। এখন আয়না দিয়ে পানির গ্লাসে রোদ ফেলার সময় না।

আম্মু বললেন, “সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট বন্ধ করে এখন নাস্তা শেষ করে আমাকে উদ্ধার কর।”

গাববু মুখ গোঁজ করে বলল, “তোমরা কেউ আমাকে কখনো কোনো এক্সপেরিমেন্ট করতে দাও না।”

টুনি বলল, “আউল-ফাউল কথা বলবি না। তুই কবে আমাদের কোন কথাটা শুনিস? তোর এক্সপেরিমেন্টের জ্বালায় এই বাসায় কেউ শান্তিতে এক মিনিট থাকতে পারে? তুই কখনো কারও কোনো কথা শুনিস?”

গাববু বলল, “অন্য কোনো বাসা হলে সবাই আমাকে সাহায্য করত। উৎসাহ দিত। তোমরা কখনো সাহায্য করো না, উৎসাহ পর্যন্ত দাও না।”

টুনি বলল, “উৎসাহ ছাড়াই আমাদের জীবন শেষ। তোকে উৎসাহ দিলে আমাদের উপায় আছে?”

আববু বললেন, “তোকে উৎসাহ দিই না কে বলেছে?”

গাববু বলল, “এই যে এখন এক্সপেরিমেন্টটা করতে দিলে না।”

“এখন কি এক্সপেরিমেন্ট করার সময়?”

“কখনো আমাকে কোনো বৈজ্ঞানিক জিনিস কিনে দাও না।”

“কখন তোকে কী কিনে দিই নি?”

গাববু মুখ শক্ত করে বলল, “কতদিন থেকে বলছি আমাকে এক বোতল সালফিউরিক অ্যাসিড আর আরেক বোতল নাইট্রিক অ্যাসিড কিনে দিতে, তুমি কিনে দিয়েছ?”

আববু বললেন, “দ্যাখ গাববু, তোকে আমি সালফিউরিক অ্যাসিড আর নাইট্রিক অ্যাসিড কিনে দেব না। সেইজন্যে তুই যদি বড় হয়ে গ্যালিলিও নিউটন না হয় আইনস্টাইন হতে না পারিস আমি তার সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিয়ে নেব। এই পৃথিবীকে একজন কম আইনস্টাইন দিয়ে ম্যানেজ করতে হবে।”

গাববু ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, “এই দেখো, তুমি আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছ।”

আববু বললেন, “আমি মোটেও ঠাট্টা করছি না। আমি খুবই সিরিয়াস।”

“তোমরা খালি দেখো, আমি একবার শুধু বড় হয়ে নিই, তখন আমার বাসায় আমি বিশাল একটা ল্যাবরেটরি বানাব। সেইখানে সবকিছু থাকবে, আমি প্লটোনিয়াম পর্যন্ত কিনে আনব।”

মিঠু জানতে চাইল, “প্লটোনিয়াম কী ভাইয়া?”

“যেটা দিয়ে নিউক্লিয়ার বোমা বানায়।”

“তুমি নিউক্লিয়ার বোমা বানাবে?”

গাববু শীতল গলায় বলল, “খালি একবার বড় হয়ে নিই।”

মিঠু বলল, “ভাইয়া, তুমি বড় হওয়ার একটা ওষুধ তৈরি করো। এক চামুচ খাবে আর এক বছর বড় হবে। দুই চামুচ খাবে আর দুই বছর বড় হবে।”

টুনি হি হি করে হেসে বলল, “ভুলে একদিন পুরো বোতল খেয়ে ফেলবি তখন খুরখুরে বুড়ো হয়ে যাবি।”

গাববু এমনভাবে টুনির দিকে তাকাল যে পারলে সে এখনই টুনিকে চোখের দৃষ্টিতে পুড়িয়ে কাবাব করে দেবে।

টুনি, গাববু আর মিঠু একই স্কুলে পড়ে। স্কুলটা বাসা থেকে খুব বেশি দূরে না, তাই প্রতিদিন তিন ভাইবোন হেঁটে হেঁটে স্কুলে যায়। স্কুলে যাওয়ার সময় প্রতিদিনই অবশ্যি একই ব্যাপার ঘটে। খানিকদূর হেঁটে যেতে যেতেই গাববু পিছিয়ে পড়ে, সে যে তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে না তা নয়, সে পিছিয়ে পড়ে তার কারণ সবকিছুতেই তার কৌতূহল। সবকিছুই তার দেখতে হয়। আজকেও তাই হচ্ছে। খানিকদূর গিয়ে টুনি আবিষ্কার করল গাববু সাথে নেই, পেছনে তাকিয়ে দেখা গেল সে গভীর মনোযোগ দিয়ে কীভাবে রিকশার চাকা পাম্প করা হচ্ছে সেটা দেখছে। টুনিকে ফিরে গিয়ে রীতিমতো তার হাত ধরে টেনে আনতে হল। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর দেখা গেল গাববু আবার পিছিয়ে পড়েছে, এবারে সে একটা ওয়াকশপে কীভাবে লেদ মেশিনে একটা পাইপকে পালিশ করা হচ্ছে সেটা দেখছে। এবারে মিঠু তাকে ঠেলে সরিয়ে আনল। কিছুক্ষণ পর গাববু আবার পিছিয়ে পড়ল, এবারে সে পাখির খাঁচা হাতে একটা মানুষের সাথে আটকা পড়েছে।

স্কুলে পৌঁছানোর পর টুনি আর মিঠু নিজের ক্লাসে চলে গেল, এখন আর তাদেরকে গাববুকে নিয়ে টানাটানি আর ধাক্কাধাক্কি করতে হবে না। গাববু স্কুলের মাঠ দিয়ে আড়াআড়িভাবে হেঁটে নিজের ক্লাসে গিয়ে জানালার কাছে একটা সিটে নিজের ব্যাগ রেখে ক্লাস থেকে বের হয়ে এল। মাঠে ছেলেমেয়েরা দৌড়াদৌড়ি করে খেলছে, সে কিছুক্ষণ তাদের দিকে তাকিয়ে রইল। রবিন নামে তার ক্লাসের একজন ডাকল, “গাববু, খেলবি? আয়।”

গাববু দৌড়াদৌড়ি করে খুব বেশি খেলে না, তাই খেলতে যাবে কী না সেটা চিন্তা করছিল, ঠিক তখন স্কুলঘরের দেয়ালে তার চোখ পড়ল। লাল রঙের একটা পিঁপড়ার সারি দেয়াল ধরে এক মাথা

থেকে অন্য মাথায় যাচ্ছে। মাঠে ছোট্টাছুটি করার থেকে এই পিঁপড়ার সারিটা কোথা থেকে শুরু করে কোথায় যাচ্ছে সেটা খুঁজে বের করা তার কাছে অনেক বেশি মজার কাজ মনে হল। তাই সে রবিনের দিকে তাকিয়ে বলল, “তোরা খেল। আমি এখন খেলব না।”

তারপর সে পিঁপড়ার সারিটা দেখতে শুরু করল। জানালার নিচে দিয়ে সেটা স্কুলঘরের পেছনে গিয়ে মাটির ভেতরে কোথায় জানি ঢুকে গেছে। পিঁপড়ার সারিটা মহাউৎসাহে একটা মরা পোকাকে টেনে আনছে, সেই দৃশ্যটা সে অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল। পিঁপড়াগুলোর মাঝে একধরনের উত্তেজনা। সামনে যাচ্ছে পেছনে যাচ্ছে, কিছুক্ষণ পোকাটাকে টানছে, অন্য একটি পিঁপড়া এসে ধাক্কা দিয়ে একজনকে সরিয়ে ঢুকে যাচ্ছে, মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে একজন আরেকজনের সাথে কথা বলছে। পিঁপড়ার কথা যদি বুঝতে পারত তাহলে কী মজাই না হতো! সে যখন একটা কাঠি দিয়ে পিঁপড়ার সারিটাকে একটু এলোমেলো করে দিয়ে কী হয় দেখছে তখন পেছন থেকে লিটন নামে মোটাসোটা একটি ছেলে জিজ্ঞেস করল, “গাববু, কী করছিস?”

গাববু বলল, “দেখছি।”

“কী দেখছিস?”

“পিঁপড়া।”

“পিঁপড়া? তুই আগে কখনো পিঁপড়া দেখিস নি? পিঁপড়া একটা দেখার মতো জিনিস হল?” লিটন হি হি করে দাঁত বের করে হাসল, কাছাকাছি রত্না নামে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তাকে ডেকে বলল, “রত্না, দেখে যা, গাববু পিঁপড়া দেখছে।”

ক্লাসের সবারই গাববুর কাজকর্ম দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে, আজকাল কেউ আর অবাক হয় না। তাই রত্নাও অবাক হল না, সেও লিটনের মতো হেসে বলল, “মানুষজন যে রকম চিড়িয়াখানায় গিয়ে বাঘ-ভাল্লুক দেখে, গাববু সেরকম দেখে পিঁপড়া।”

লিটন আর রত্নার কথা শুনে গাববুর একটু রাগ হল, সে মুখ শক্ত করে বলল, “তোরা কখনো একটা পিঁপড়াকে ঠিক করে দেখেছিস?”

লিটন বলল, “দেখব না কেন!”

“পিঁপড়ার কয়টা পা, বল দেখি।”

“আট দশটা হবে।”

“উঁহু।” গাববু বলল, “ছয়টা।”

“একই কথা।”

“কখনোই একই কথা না-আট পা থাকে মাকড়সার। পিঁপড়ার চোখ কী রকম বল দেখি।”

“চোখ আবার কী রকম, চোখের মতো।”

“উঁহ্। পিঁপড়ার চোখ হচ্ছে কম্পাউন্ড আই। অনেকগুলো ছোট ছোট চোখ মিলে একটা চোখ, বাংলায় বলে পুঞ্জাক্ষী।”

“তোকে বলেছে!”

“পিঁপড়ার শরীরে কি হাড় আছে?”

“হাড়?” রত্না হেসে বলল, “পিঁপড়ার আবার হাড় থাকবে কেমন করে?”

“আছে।” গাববু গম্ভীর হয়ে বলল, “পিঁপড়ার শরীরের খোসাটাই হচ্ছে হাড়।”

লিটন মুখ বাঁকা করে বলল, “গুলপাট্টি।”

“মোটোও গুলপাট্টি না। বল দেখি, পিঁপড়া কামড় দিলে ব্যথা লাগে কেন?”

লিটন বলল, “এটা আবার কী রকম প্রশ্ন? কামড় দিলে তো ব্যথা লাগবেই।”

“কামড় দিলে ব্যথা লাগে, তার কারণ পিঁপড়ার কামড়ে আছে ফরমিক অ্যাসিড।”

লিটন মুখ শক্ত করে বলল, “কাঁচকলা।”

কাঁচকলা শুনেও গাববু খামল না, বলল, “বল দেখি পিঁপড়া কীভাবে লাইন ধরে যায়?”

“যেভাবে যায় সেভাবে যায়।”

“উঁহ্।”

রত্না হি হি করে হেসে বলল, “এক পিঁপড়া আরেক পিঁপড়াকে জিজ্ঞেস করে, ভাই কোনদিকে যাব? তখন সেই পিঁপড়া বলে, এদিকে যাও না হলে ওদিকে যাও। তখন পিঁপড়া এদিক-সেদিক যায়।”

গাববু বলল, “মোটোও না। পিঁপড়া যেদিকে যায় সেখানে একটা গন্ধ থাকে। পিঁপড়ারা সেই গন্ধ শুঁকে শুঁকে যায়।

লিটন কাছে এসে নাক কুঁচকে একটু গন্ধ শোঁকার চেষ্টা করে বলল, “কই আমি তো কোনো গন্ধ পাচ্ছি না।”

গাববু বলল, “তুই তো আর পিঁপড়া না। যদি তুই পিঁপড়া হতিস তাহলে ঠিকই গন্ধ পাবি।”

রত্না হেসে গড়িয়ে পড়ল, “লিটন হবে পিঁপড়া? লিটনের ওজন কয় কেজি তুই জানিস? একবারে কয়টা হাম বার্গার খায় তুই জানিস? দশটা।”

লিটন রেগে উঠে বলল, “আমি মোটোও একবারে দশটা হাম বার্গার খাই না।”

“খাস।” রত্না বলল, “মিলির জন্মদিনের পার্টিতে আমি নিজের চোখে দেখেছি।”

“মোটোই দশটা খাইনি। ছোট ছোট হাম বার্গার-”

“মোটোও ছোট ছোট না। এতো বড় বড়।”

লিটন আর রত্না হাম বার্গারের সাইজ নিয়ে ঝগড়া করতে করতে অন্যদিকে চলে গেল, গাববু তখন আবার পিঁপড়ার সারি দেখতে শুরু করে। মাটির নিচে যেখানে ঢুকে গেছে সেখানে খুঁড়ে দেখতে পারলে হতো, পিঁপড়ার রানীটাকে নিশ্চয়ই সেখানে পাওয়া যাবে। সে হাঁটু গেড়ে বসে একটা কাঠি দিয়ে মাঠি খুঁড়তে শুরু করে।

“এই ছেলে, তুমি কী করছ এখানে?” প্রচন্ড ধমক শুনে গাববু পেছন ফিরে তাকাল। তাদের প্রিন্সিপাল কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। প্রিন্সিপালের গলা নেই, ঘাড়ের ওপর সরাসরি মাথা লাগানো, ঠোঁটের ওপর সরু গোঁফ এবং লাল চোখ। চুল মিলিটারিদের মতো ছোট ছোট করে ছাঁটা। তিনি যখন রাগেন তখন মুখের দুই পাশের দুটি দাঁত বের হয়ে আসে, গাববু জানে মাংশাসী প্রাণীর মাংস ছিঁড়ে খাওয়ার জন্যে এরকম ধারালো দুটি দাঁত থাকে। এগুলোকে বলে কেনাইন দাঁত।

প্রিন্সিপাল আবার ধমক দিলেন, “কী করছ এখানে?”

“রানী খুঁজছিলাম স্যার।”

প্রিন্সিপাল গাববুর কথা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলেন, চিৎকার করে বললেন, “আমার সাথে ইয়ার্কি করছ? তুমি রানী খুঁজছ? স্কুলে এসেছ রাজকন্যা-রানী খোঁজার জন্যে? কোন দেশের রানী তোমার জন্যে এইখানে অপেক্ষা করছে?”

“কোনো দেশের রানী না স্যার-”

“চাবকে তোমাকে সোজা করে দেব। পিঠের ছাল তুলে দেব।”

“শারীরিক শাস্তি দেওয়া উঠে গেছে স্যার। শারীরিক শাস্তি এখন আইনত বেআইনি। হাইকোর্ট বলেছে-”

প্রিন্সিপাল পারলে তখন তখনই বাঘের মতো গাববুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ধারালো দাঁত দুটি দিয়ে গলার রগ ছিঁড়ে ফেলেন, অনেক কষ্ট করে নিজেকে স্থির রেখে দুই হাত দিয়ে গাববুর মাথা ধড় থেকে ছিঁড়ে ফেলার ভান করে বললেন, “তোমার এত বড় সাহস? আমাকে তুমি হাইকোর্ট দেখাও? তুমি আমার সাথে টিটকারি মারবে, বলবে একজন রানী খুঁজে বেড়াচ্ছ, আর আমি তোমাকে ছেড়ে দেব? রাজা রানী রাজকন্যা তোমার জন্যে এখানে বসে আছে-মশকরা করার জায়গা পাও না?”

গাববু বুঝল যতই সময় যাচ্ছে ততই সে আরো বেশি বিপদের মাঝে পড়ে যাচ্ছে, রানী বলতে সে মোটেও গল্পের রাজা-রানী বলেনি সেইটা পরিষ্কার করতে হবে, তাই গলা উঁচিয়ে বলল, “স্যার, আমি পিঁপড়াদের রানীর কথা বলছিলাম। এই পিঁপড়াগুলো শ্রমিক পিঁপড়া, তাদের একটা রানী আছে, আমি সেই রানীর কথা বলছিলাম।”

প্রিন্সিপাল স্যার হঠাৎ করে বিষয়টা বুঝতে পারলেন। কিন্তু তাতে তার রাগ কমল না। তার চিৎকার শুনে আশেপাশে ছেলেমেয়েদের একটা ভিড় জমে গেছে। তাদের ভেতর থেকে একটা ছোট হাসির আওয়াজ শুরু হয়ে প্রায় সাথে সাথে থেমে গেল। প্রিন্সিপাল স্যারের গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, সেটা রাগে বেগুনি হয়ে গেল। নাক দিয়ে ফোঁস করে একটা শব্দ করে বললেন, “বেয়াদব ছেলে, তোমাকে আমি সিধে করে ছাড়ব।”

কথা শেষ করে গট গট করে হেঁটে চলে গেলেন। ছেলে মেয়েরা তখন গাববুকে ঘিরে দাঁড়াল, লিটন বলল, “প্রিন্সিপাল স্যার এখন তোকে কাঁচা খেয়ে ফেলবে।”

রত্না বলল, “তুই হচ্ছিস এক নম্বর গাধা।”

গাববু মুখ শক্ত করে বলল, “কেন? আমি গাধা কেন হব?”

“গাধা না হলে কেউ প্রিন্সিপাল স্যারকে হাইকোর্টের ভয় দেখায়?”

“আমি কি মিথ্যা কথা বলেছি? আসলেই তো হাইকোর্ট রায় দিয়েছে কেউ কোনো ছাত্রকে পেটাতে পারবে না।”

মিলি ক্লাসের সবচেয়ে ভালো ছাত্রী, সেজন্যে অহঙ্কারে মাটিতে তার পা পড়ে না, সে মুখ সুঁচালো করে বলল, “তোর কী দরকার পড়েছিল মাটি খুঁড়ে পিঁপড়ার রানী বের করার? এর থেকে বিজ্ঞান বইয়ের দুই পৃষ্ঠা মুখস্থ করিস না কেন? আমাদের বিজ্ঞান বইয়ে পিঁপড়ার কোনো চ্যাপ্টার পর্যন্ত নাই-”

গাববু কী বলবে বুঝতে পারল না। ক্লাসের ছেলেমেয়েদের সে ভালো করে কখনো বুঝতে পারে না।

বাংলা, গণিত আর ইংরেজি ক্লাস পর্যন্ত গাববু সহ্য করল, সমাজপাঠ ক্লাসে সে আর সহ্য করতে পারল না, তার মনে হল ক্লাস থেকে বের হয়ে স্কুলের বাউন্ডারি ওয়ালে পা ঝুলিয়ে বসে থাকে। রওশন ম্যাডাম ক্লাস নিচ্ছেন, তার গলার শব্দ এত একঘেয়ে যে গাববুর মনে হতে লাগল যে সে পাগল হয়ে যাবে। কাজেই সময় কাটানোর জন্যে সে তার স্কুলের ব্যাগ থেকে একটা বই বের করল, বইয়ের নাম “বিজ্ঞানের শত প্রশ্ন”।

গাববু সাবধানে বইটা খুলে পড়তে থাকে, এই বইয়ে লেখা বেশির ভাগ জিনিস সে জানে। একটা প্রশ্নের উত্তর ভুল, তবে মানুষের মস্তিষ্ক নিয়ে অংশটা বেশ মজার। কাতুকুতু কেন লাগে, কী করলে কাতুকুতুর অনুভূতি থেকে মুক্তি পাওয়া যায়-এই অংশটা সে আগে জানতো না। বিষয়টা তখন তখনই সে পরীক্ষা করে দেখল, নিজেকে সে নানাভাবে কাতুকুতু দিতে লাগল এবং সত্যি সত্যি তার

কাতুকুতু পেল না। পাশে মিলি বসেছিল, সে ভুরু কুঁচকে গাববুর দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, “কী করছিস?”

গাববুও গলা নামিয়ে বলল, “কাতুকুতু দিচ্ছি।”

“কাতুকুতু দিচ্ছিস? কেন?”

“নিজেকে দেওয়া যায় কি না পরীক্ষা করছি। দেওয়া যায় না।”

“নিজেকে মানুষ আবার কেমন করে কাতুকুতু দেবে?”

“দিতে পারে না। অন্যকে পারে। তোকে একটু কাতুকুতু দিই?”

“না।” মিলি চোখ পাকিয়ে বলল, “খবরদার।”

“একটু, প্লিজ।”

“না।”

“প্লিজ!” গাববু নরম গলায় বলল, “বেশি দেব না।” বলে সে মিলিকে কাতুকুতু দেওয়ার চেষ্টা করল, আর মিলি তড়াক করে লাফ দিয়ে চিৎকার করে উঠল, “ম্যাডাম! গাববু আমাকে জ্বালাচ্ছে।”

ম্যাডাম পড়ানো বন্ধ করে চশমার ওপর দিয়ে গাববুর দিকে তাকালেন, রাগী গলায় বললেন, “গাববু!”

গাববু বলল, “জি ম্যাডাম।”

“কী করছ তুমি?”

“কিছু করছি না।”

মিলি বলল, “করছে ম্যাডাম, আমাকে কাতুকুতু দিচ্ছে।”

মিলির কথা শুনে সারা ক্লাস হেসে উঠল। ম্যাডামের মুখ তখন আরও শক্ত হয়ে উঠল, শীতল গলায় বললেন, “তুমি ক্লাসে একজনকে কাতুকুতু দিচ্ছ? তোমার এত বড় সাহস?”

গাববু অপরাধীর মতো বলল, “না ম্যাডাম, আমি আসলে কাতুকুতু দিচ্ছি না, আমি আসলে দেখাচ্ছিলাম কীভাবে কাতুকুতু দিলে কাতুকুতু লাগে না।”

ম্যাডাম চোখ কপালে তুলে বললেন, “তুমি শিখাচ্ছিলে কীভাবে কাতুকুতু দিলে কাতুকুতু লাগে না?”

“জি ম্যাডাম।”

“কীভাবে শুনতে পারি?”

গাববু উৎসাহ নিয়ে বলল, “খুব সোজা। এই দেখুন আমি নিজেকে কাতুকুতু দিচ্ছি-” বলে গাববু নিজেকে নানাভাবে কাতুকুতু দেয় এবং সেই দৃশ্য দেখে ক্লাসের ছেলেমেয়েরা আনন্দে হাসতে থাকে। গাববু তখন কাতুকুতু দেওয়া থামিয়ে বলল, “আমার একটুও কাতুকুতু পায় নি। ম্যাডাম আপনি নিজেকে কাতুকুতু দেওয়ার চেষ্টা করেন, দেখবেন কাতুকুতু পাবে না। দেখেন চেষ্টা করে-”

ম্যাডাম মুখ শক্ত করে বললেন, “আমার চেষ্টা করতে হবে না। আমি জানি মানুষ নিজেকে কাতুকুতু দিতে পারে না।”

গাববু এবারে বজ্রতা দেওয়ার মতো করে বলল, “আমরা নিজেকে কাতুকুতু দিলে সবসময় জানি কোথায় কাতুকুতু দেওয়া হবে, সেইজন্যে কাতুকুতু লাগে না। তাই আমি যদি আপনাকে কাতুকুতু দিই আর আপনি যদি আগে থেকে জানেন কোথায় কাতুকুতু দেব তাহলে আপনারও কাতুকুতু পাবে না।”

ম্যাডাম কোনো কথা না বলে একধরনের বিস্ময় নিয়ে গাববুর দিকে তাকিয়ে রইলেন। গাববু আবার বজ্রতার মতো করে বলতে লাগল, “আপনাকে করে দেখাব ম্যাডাম? আপনি আপনার হাতটা আমার হাতের ওপর রাখবেন। আমি সেই হাত দিয়ে আপনাকে কাতুকুতু দেব। আপনি তাহলে আগে থেকে জানবেন আমার হাতটা কোনদিকে যাচ্ছে, কোথায় কাতুকুতু দিচ্ছে। আপনার তাহলে আর কাতুকুতু পাবে না। আমি মিলিকে এইটাই দেখতে চাচ্ছিলাম, মিলি তখন নালিশ করেছে। আপনাকে করে দেখাব ম্যাডাম?”

ম্যাডামের চোখ কেমন যেন বিস্ফারিত হয়ে গেল, তিনি অবিশ্বাসের গলায় বললেন, “তুমি আ-মা-কে কাতুকুতু দেবে?”

“জি ম্যাডাম, আপনি যদি চান।”

“না, আমি চাই না। ক্লাসের ছেলেমেয়েরা যদি তাদের স্যার ম্যাডামদের কাতুকুতু দেওয়া শুরু করে তাহলে তাতে স্কুলের ডিসিপ্লিনের খুব বড় সমস্যা হতে পারে। বাইরে সেই খবর গেলে স্কুলের অস্তিত্ব নিয়ে টানাটানি শুরু হয়ে যাবে, বুঝেছ?”

গাববু নিঃশ্বাস ফেলে বলল, “বুঝেছি।”

ম্যাডাম বললেন, “মনে হয় বোঝো নাই। ক্লাসে তোমার কোনো মনোযোগ নেই। আমি কী পড়াই তুমি সেটা শোনো না। আজব আজব বিষয় নিয়ে কথা বল। ক্লাসে ডিস্টার্ব করো। তুমি খুব বড় সমস্যা।”

গাববু অবাক হয়ে বলল, “সমস্যা? আমি?”

ম্যাডাম মুখ শক্ত করে বললেন, “হ্যাঁ, তুমি। আমরা অনেক সহ্য করেছি, আর সহ্য করা হবে না। তুমি যদি ক্লাসের ডিসিপ্লিন নষ্ট করো এখন সেটা প্রিন্সিপালকে রিপোর্ট করা হবে। তোমার বাবা-মাকে জানানো হবে। বুঝেছ?”

গাববু নিচু গলায় বলল, “বুঝেছি।”

ম্যাডাম কঠিন গলায় বললেন, “এখন থেকে ক্লাসে আমি আর কোনো থিংওরি শুনতে চাই না। চুপ করে ক্লাসে বসে থাকো। মনোযোগটা অন্য কোনোদিকে না দিয়ে আমি কী পড়াচ্ছি সেদিকে দাও, বুঝেছ?”

গাববু দুর্বল গলায় বলল, “জি ম্যাডাম, বুঝেছি।”

স্কুল ছুটির পর যখন টুনি, গাববু আর মিঠু বাসায় আসছিল তখন গাববুকে কেমন জানি অন্যমনস্ক দেখাতে লাগল। অন্যদিনের মতো সে পিছিয়ে পড়ল না, এদিক-সেদিক কোনোকিছু দেখার জন্যে দাঁড়িয়ে পড়ল না, আজ তার মনটা ভালো নেই। সে কিছুতেই বুঝতে পারল না, চারপাশের মানুষেরা এরকম কেন? কেউ তাকে বুঝতে পারে না কেন?

৫

স্কুল থেকে এসে তিন ভাইবোন হাত মুখ ধুয়ে ডাইনিং টেবিলে বসে খাচ্ছে। প্রত্যেকদিনই আন্সু এই সময়টাতে তাদের সাথে স্কুল নিয়ে কথা বলেন। আজকেও শুরু করলেন, “আজকে তোদের স্কুল কেমন হল?”

মিঠু বলল, “খুবই মজার আন্সু, খুবই মজার।”

আন্সু জানতে চাইলেন, “কেন কী হয়েছে?”

মিঠু এক চুমুক দুধ খেয়ে বলল, “আমাদের ক্লাসে একটা নতুন ছেলে ভর্তি হয়েছে। এই মোটা। সে প্রিন্সিপাল স্যারকে ভেবেছে দগুরি-” মিঠু কথা শেষ না করে হি হি করে হাসতে থাকে এবং বিষম খেয়ে নাক দিয়ে কয়েক ফোঁটা দুধ বের হয়ে আসে।

গাববু গভীর মনোযোগ দিয়ে মিঠুর দিকে তাকিয়ে থাকে। নাকের সাথে গলার যোগাযোগ আছে, আর গলা দিয়ে যাওয়া জিনিস নাক দিয়ে বের হতে পারে-এরকম একটা সম্ভাবনা আছে সে জানত। চোখের সামনে এত বড় একটা বৈজ্ঞানিক ঘটনা দেখেও সে চুপ করে রইল, বিষয়টা অন্যদের ব্যাখ্যা করে বোঝানোর চেষ্টা করল না, তার মনটা খারাপ তাই কথা বলতে ইচ্ছে করছে না।

আন্সু বললেন, “প্রিন্সিপাল স্যারকে দগুরি ভেবেছে?”

“হ্যাঁ। ভর্তির কাগজ নিয়ে প্রিন্সিপাল স্যারের অফিসে গিয়েছে, প্রিন্সিপাল স্যার টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কী একটা কাজ করছিলেন, মোটা ছেলেটা বলল, এই যে দপ্তরি ভাই, প্রিন্সিপাল স্যার কই?” মিঠু কথা শেষ না করে আবার হি হি করে হাসতে থাকে।

আম্মু বললেন, “অনেক হয়েছে। এখন হাসি বন্ধ করে খা।”

তারপর টুনির দিকে তাকিয়ে বললেন, “তোর স্কুল কী রকম হয়েছে?”

টুনি বলল, “প্রত্যেকদিন যে রকম হয় সে রকম।”

আম্মু গাববুর দিকে তাকালেন, “তোর?”

গাববু একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলল, “আমার জন্যে বাসা যে রকম স্কুলও সে রকম।”

“তার মানে কী?”

“তার মানে হচ্ছে বাসায় তোমরা যে রকম সারাক্ষণ আমাকে জ্বালাও, স্কুলেও সে রকম সবাই আমাকে জ্বালায়।”

“আজকে তোকে কে জ্বালিয়েছে?”

“সবাই।”

আম্মু অবাক হয়ে বললেন, “সবাই?”

“হ্যাঁ। লিটন, রত্না, মিলি, রওশন ম্যাডাম, প্রিন্সিপাল স্যার-সবাই।”

“এতজন মানুষ তোকে একসাথে কেমন করে জ্বালালো? তুই কী করছিলি?”

“আমি কিছু করি নাই।”

টুনি বলল, “আম্মু, তুমি গাববুর কথা বিশ্বাস কোরো না। নিশ্চয়ই কাউকে দিয়ে সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট করেছে। সেটা করতে গিয়ে কোনো ঝামেলা করেছে।”

“করি নাই।” গাববু মুখ শক্ত করে বলল, “শুধু-”

“শুধু কী?”

“শুধু কেমন করে কাতুকুতু দিলেও কাতুকুতু লাগবে না সেইটা দেখতে চাচ্ছিলাম, তখন-তখন-”

“তখন কী?”

গাববু হতাশ হওয়ার মতো করে বলল, “নাহ, কিছু না।”

“শুনি। বল।”

“রওশন ম্যাডাম এত ভালো ম্যাডাম-সেই ম্যাডামও আমার কথা বিশ্বাস করতে রাজি হলেন না। উল্টো আমাকে-” গাববু আবার কথা শেষ না করে থেমে গেল।

“উল্টো কী?”

“নাহ্, কিছু না।”

“কিছু না মানে? উল্টো তোকে কী?”

“এই উল্টাপাল্টা কথা।”

“কী উল্টাপাল্টা কথা?”

গাববুর সেই কথাগুলো বলতে ইচ্ছে করল না, আবার মনটা খারাপ হয়ে গেল। সে তখন গভীর মনোযোগ দিয়ে একটা কলা খেতে শুরু করল। আম্মু আবার জিজ্ঞেস করলেন, “কী উল্টাপাল্টা কথা?”

গাববু কলার দিকে তাকিয়ে বলল, “কলার মাঝে পটাশিয়াম থাকে।”

আম্মু বললেন, “তার মানে তুই বলবি না?”

গাববু বলল, “কলাগাছকে মানুষ গাছ বলে। আসলে কলাগাছ কিন্তু গাছ না।”

আম্মু হাল ছেড়ে দিলেন।

গাববু খাওয়া শেষ করে উঠে যাওয়ার পর আম্মু টুনিকে জিজ্ঞেস করলেন, “কী হয়েছে স্কুলে? কিছু জানিস?”

টুনি বলল, “কী আর হবে? বাসায় যেটা হয় স্কুলেও নিশ্চয়ই সেটাই হয়েছে।”

মিঠু বলল, “ভাইয়ার এক্সপেরিমেন্ট। সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট।”

আম্মু জানতে চাইলেন, “কী এক্সপেরিমেন্ট?”

মিঠু ঠোঁট উল্টে বলল, “জানি না।”

ঠিক এরকম সময় পাশের ঘর থেকে ধূপ করে একটা শব্দ হল, মনে হল ভারী কিছু একটা নিচে পড়েছে। আম্মু চমকে উঠে বললেন, “কিসের শব্দ?”

টুনি বলল, “কিসের আবার! নিশ্চয়ই তোমার ছেলের কোনো সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট।”

মিঠু বলল, “আমি দেখে আসি।”

মিঠুর পিছু পিছু টুনি আর আম্মুও গেলেন, গিয়ে দেখলেন গাববু মেঝেতে কয়েকটা বালিশ রেখেছে, তারপর টেবিলের ওপর উঠে সেগুলোর ওপর লাফিয়ে পড়ছে। আম্মু চোখ কপালে তুলে বললেন, “কী হচ্ছে, গাববু, কী হচ্ছে এখানে?”

“কিছু না”-বলে গাববু আবার টেবিলের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ল। আম্মু বললেন, “কিছু না মানে? দেখতে পাচ্ছি তুই লাফাচ্ছিস আর বলছিস কিছু না।”

গাববু আবার টেবিলের ওপর উঠে লাফ দেওয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বলল, “বলছি কিছু না। তার কারণ আমি কী করছি সেটা তোমাদের বলে লাভ নাই। তোমরা বুঝবে না।”

টুনি বলল, “বলে দেখ। বুঝতেও তো পারি।”

“সময় নষ্ট করে লাভ নাই। তোমরা বুঝবে না।”

আম্মু বললেন, “আমার বোঝার দরকার নাই। যদি এভাবে বানরের মতো লাফাবি তাহলে বাসার ভেতরে না-বাইরে। আর শুনে রাখ, লাফ দিয়ে যদি ঠ্যাং ভাঙিস তাহলে কিন্তু আমার কাছে আসবি না।”

গাববু বলল, “আমার ঠ্যাং প্লাস্টিকের না যে একটা লাফ দিলেই ভেঙে যাবে।”

“খুব ভালো কথা। কিন্তু লাফালাফি ঘরের ভেতরে না-বাইরে।”

গাববু টেবিল থেকে লাফ দিয়ে নিচে নেমে বলল, “ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি বাইরে যাচ্ছি। তোমাদের যন্ত্রণায় আমি কিছু করতে পারি না। খালি একবার বড় হয়ে নিই তখন দেখি তোমরা আমাকে কীভাবে যন্ত্রণা দাও। আমার যা ইচ্ছা আমি তখন সেটা করব।”

মিঠু জানত চাইল, “বড় হয়ে তুমি কী করবে ভাইয়া? আরও উপর থেকে লাফ দেবে?”

গাববু বলল, “তুই সেটা বুঝবি না।”

তারপর পায়ে জুতো পরে সে গম্ভীর মুখে বের হয়ে এল।

মোটামুটি এই একই সময়ে রিফাত হাসান হোটেলের লবিতে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। রিসেপশনিস্ট মেয়েটি এগিয়ে এসে বলল, “স্যার, আপনার কি কিছু লাগবে? কোনো সমস্যা।”

“সমস্যা তো বটেই!”

“আমরা কি কিছু করতে পারি?”

“মনে হয় না।”

“বলে দেখেন। আমরা কত কী করতে পারি জানলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন।”

রিফাত হাসান ঘুরে গেটের দিকে দেখিয়ে বললেন, “ওই গেটে দেখেছেন কতজন সাংবাদিক ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে?”

রিসেপশনিস্ট মেয়েটা বলল, “দেখেছি। সবাই আপনাকে কাভার করার জন্যে এসেছে। কার আগে আপনাকে নিয়ে কত বড় স্টোরি করতে পারে সেটা নিয়ে প্রতিযোগিতা! এটাকে বলে খ্যাতির বিড়ম্বনা।”

“খ্যাতি থাকলে বিড়ম্বনা সহ্য করার একটা অর্থ আছে। আমাকে কেন? আমি ফিল্মস্টার না, রকস্টার না, ক্রিকেট প্লেয়ারও না! আমাকে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কেন?”

“স্যার, আপনি ফিল্মস্টার, রকস্টার কিংবা ক্রিকেট প্লেয়ার থেকে কোনো অংশ কম না। এই দেশের মানুষ জেনে গেছে আপনি এখানে এসেছেন, তিন দিন দেশে থাকবেন। আপনাকে নিয়ে অনেক কৌতূহল। শুধু আপনার খোঁজে আমাদের হোটেলের এত ফোন এসেছে যে আমাদের পিএবিএক্স ওভারলোড হয়ে যাওয়ার অবস্থা! স্যার, আপনি অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ!”

“আমি গুরুত্বপূর্ণ মানুষ কি না জানি না, কিন্তু সকাল থেকে শুধু গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের সাথে কথা বলছি! এখন আমি একটু নিজের মতো থাকতে চাই। হোটেলের গেটে সাংবাদিকেরা বাঘের মতো বসে আছে, বের হওয়ামাত্রই ঝাঁপিয়ে পড়বে!”

রিসেপশনিস্ট মেয়েটা কী যেন একটা ভাবল, তারপর জিজ্ঞেস করল, “আপনি কোথায় যেতে চান স্যার?”

“যখন ছোট ছিলাম তখন আমাদের বাসা ছিল গেভারিয়ার দিকে। ভাবছিলাম জায়গাটা একটু দেখব।”

“কাকে নিয়ে যাবেন?”

রিফাত হাসান মাথা নেড়ে বললেন, “কাউকে নিয়ে নয়। একা একা।”

মেয়েটি অবাক হয়ে বলল, “একা একা? আপনি নিজে?”

রিফাত হাসান বললেন, “এতে অবাক হওয়ার কী আছে?”

“পারবেন?”

“না পারার কী আছে? আমি এই দেশের মানুষ না? আমি এখানে বড় হয়েছি, জীবনের ইম্পরট্যান্ট সময়টা এখানে কাটিয়েছি।”

“ঠিক আছে, আপনি যদি সত্যিই মনে করেন আপনি একা একা ঘুরতে পারেন তাহলে আমি আপনাকে বাইরে বের করার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারি!”

“সত্যি? পারবেন?”

“হ্যাঁ। পারব। আমাদের হোটেলের পেছনে একটা সার্ভিস ডোর আছে, আপনি চাইলে আপনাকে আমি সেদিক দিয়ে বের করে দিতে পারি। কেউ জানবেও না, আপনার পিছুও নিতে পারবে না।”

রিফাত হাসানের চোখেমুখে আনন্দের একটা ছাপ পড়ল। ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে বললেন, “ও! থ্যাংকু থ্যাংকু থ্যাংকু। আপনাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব বুঝতে পারছি না!”

রিসেপশনিস্ট মেয়েটি বলল, “ধন্যবাদ দিতে হবে না, অন্য একটা কিছু দিলেই হবে।”

“কী?”

“একটা অটোগ্রাফ। আপনি আমাদের হোটেলে উঠেছেন জানার পর থেকে আমার ছোটবোন আপনার একটা অটোগ্রাফের জন্যে আমার মাথা খারাপ করে ফেলছে! প্লিজ একটা অটোগ্রাফ দেবেন?”

রিফাত হাসান বললেন, “একটা কেন? আপনাকে দশটা অটোগ্রাফ দেব-আপনি শুধু আমাকে গোপনে বের হওয়ার একটা ব্যবস্থা করে দেন!”

রিফাত হাসান যখন একটুকরো কাগজে একটা অটোগ্রাফ দিচ্ছেন তখন রিসেপশনিস্ট মেয়েটি বলল, “আজকে আমার ছোট বোনের কাছে আমার স্ট্যাটাস কত বেড়ে যাবে আপনি চিন্তাও করতে পারবেন না!”

রিফাত হাসান কিছু না বলে একটু হাসলেন।

একটু পর সত্যি সত্যি রিসেপশনিস্ট মেয়েটি রিফাত হাসানকে বাইরে নিয়ে এল। বড় রাস্তায় এগিয়ে দিয়ে বলল, “এখন আপনি যেতে পারবেন?”

“অবশ্যই পারব।”

“আমার ধারণা খুব বেশি দূর যেতে পারবেন না। পাবলিক আপনাকে ছেকে ধরবে।”

“ধরবে না। পাবলিক যেহেতু ফুটপাথে রাস্তাঘাটে আমাকে দেখতে আশা করে না তাই আমাকে দেখলেও চিনবে না।”

“না চিনলেই ভালো। গুড লাক।”

রিফাত হাসান মাথা নেড়ে সামনে এগিয়ে গেলেন।

সত্যি সত্যি কেউ তাকে চিনল না। তিনি রাস্তা ধরে হাঁটলেন, দুইপাশের দোকানগুলো দেখলেন। ফুটপাথে বসে থাকা হকারদের দেখলেন, মানুষের ভিড়ের সাথে মিশে রাস্তা পার হলেন, ওভারব্রিজে দাঁড়িয়ে ট্রাফিক দেখলেন। তারপর একটা স্কুটারের সাথে দরদাম করে তার শৈশবের এলাকাতে রওনা দিলেন।

স্কুটার থেকে নেমে চারিদিকে একবার তাকিয়ে তিনি হকচকিয়ে গেলেন। স্কুটারের ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি আমাকে ঠিক জায়গায় নামিয়েছেন তো?”

ড্রাইভার দাঁত বের করে হাসল, বলল, “জে স্যার। ঠিক জায়গায় নামিয়েছি।”

স্কুটারের ভাড়া মিটিয়ে রিফাত হাসান রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকেন, তার মনে হতে থাকে তিনি যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত একটা জায়গায় হাঁটছেন। এই রাস্তা ধরে বগলে বইয়ের ব্যাগ চেপে ধরে অসংখ্যবার হেঁটে গেছেন, ব্যাপারটা তার বিশ্বাসই হতে চায় না। রাস্তাটা ছেলেবেলায় তার বিশাল মনে

হতো, এখন মনে হচ্ছে সরু একটা রাস্তা। একটা গলির মোড়ে রিফাত হাসান দাঁড়িয়ে গেলেন, এইখানে একটা ছোট দোকান ছিল, হাতে পয়সা থাকলে এই দোকান থেকে চুইংগাম কিনতেন। সেই দোকানটা নেই, তার বদলে এইখানে একটা শপিং প্লাজা। কী আশ্চর্য!

রিফাত হাসান আরও কিছুদূর হেঁটে গেলেন, সামনে একটা বিশাল মাঠ ছিল, যদি গিয়ে দেখেন মাঠটা নেই, চৌকোনা চৌকানা কুৎসিত বিল্ডিং পুরো মাঠ ভরে ফেলেছে তাহলে তাঁর মনে হয় দুঃখে হার্ট অ্যাটাক হয়ে যাবে। রিফাত হাসান ভয়ে ভয়ে হেঁটে সামনে গিয়ে ডানদিকে তাকালেন এবং বুক থেকে একটা শ্বাস বের করে দিলেন। মাঠটা আছে, আগে যেরকম বিশাল তেপান্তরের মাঠের মতো মনে হতো এখন সে রকম মনে হচ্ছে না। মাঠটা বেশ ছোট এবং রিফাত হাসানকে স্বীকার করতেই হবে, বেশ নোংরা। অবশ্যি আঠারো বছর পর এ দেশে এসে সবকিছুকেই নোংরা মনে হয় সেটা তিনি মেনেই নিয়েছেন। রিফাত হাসান হেঁটে এগিয়ে গেলেন, মাঠের মাছখানে একটা গরু ঘাস খাচ্ছে। এক কোনায় বেশ কিছু ছেলে ক্রিকেট খেলছে। রিফাত হাসান মাঠের এক কোনায় দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকালেন, তাদের বাসাটা যেখানে ছিল সেখানে একটা কুৎসিত ছয়তারা ফ্ল্যাট। রিফাত হাসান আশ্তে আশ্তে মাঠের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলেন, চারিদিকে বড় বড় গাছ ছিল, এখন বেশিরভাগ গাছ নেই। মাঠের মাঝামাঝি গাছটা এখনো আছে। এই গাছটা তার প্রিয় গাছ ছিল। কতদিন এই গাছটার ডাল ধরে ঝাঁপাঝাঁপি করেছেন। আর কী আশ্চর্য, গাছের পাশে লোহার বেঞ্চটাও এখনো আছে, রাত্রিবেলা এই বেঞ্চটাতে শুয়ে শুয়ে তিনি আকাশের তারা দেখতেন।

রিফাত হাসান গাছটার দিকে হেঁটে যেতে থাকলেন এবং তখন লক্ষ করলেন গাছের ডালে দশ-বারো বছরের একটা ছেলে, চোখে চশমা গায়ে লাল রঙের একটা টিশার্ট। ছেলেটা ডালটাতে উঠে দাঁড়াল এবং তাকে অবাক করে ছেলেটা গাছ থেকে লাফ দিল। এত উঁচু থেকে কেউ সাধারণত লাফ দেয় না।

ছেলেটা নিচে পড়ে নিশ্চয়ই ব্যথা পেয়েছে, কারণ রিফাত হাসান শুনতে পেলেন সে যন্ত্রণার মতো শব্দ করছে। রিফাত হাসান তার কাছে ছুটে গেলেন, জিজ্ঞেস করলেন, “ব্যথা পেয়েছ, ব্যথা পেয়েছ তুমি?”

ছেলেটা উত্তর না দিয়ে আবার যন্ত্রণার মতো শব্দ করল। রিফাত হাসান কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “উঠতে পারবে? ধরব তোমাকে?”

ছেলেটা তখনো কথা বলল না, তার পায়ে যেখানে ব্যথা পেয়েছে সেখানে হাত বুলাতে লাগল। রিফাত হাসান বললেন, “কী হল? কথা বলছ না কেন?”

ছেলেটি পা'টাকে সোজা করার চেষ্টা করতে করতে বলল, “আমি অপরিচিত মানুষের সাথে কথা বলি না।”

ছেলেটি গাববু এবং এই বাক্যটি দিয়ে রিফাত হাসানের সাথে তার পরিচয়ের সূত্রপাত হল।

রিফাত হাসান গাববুর কথা শুনে হেসে ফেললেন, বললেন, “ও আচ্ছা! সেটা অবশ্যি ভালো। অপরিচিত মানুষের সাথে কথা না বলাই ভালো। পৃথিবীতে কতরকম মানুষ আছে, কী বল?”

গাববু এবারও কোনো কথা বলল না, উঠে দাঁড়িয়ে ন্যাংচাতে ন্যাংচাতে হেঁটে লোহার বেঞ্চটাতে গিয়ে বসল। রিফাত হাসান জিজ্ঞেস করলেন, “ব্যথাটা কি একটু কমেছে?”

গাববু কথার উত্তর না দিয়ে হাত দিয়ে মুখটা জিপ করে বন্ধ করার মতো ভঙ্গি করল, ভঙ্গিটা খুবই স্পষ্ট, তার মুখ জিপ করে দেওয়া হয়েছে, সে কোনো কথা বলবে না। রিফাত হাসান বললেন, “ও আচ্ছা, মুখ বন্ধ? নো টক।”

গাববু মাথা নাড়ল। রিফাত হাসান বেঞ্চের একপাশে বসে বললেন, “আমি যদি আমার পরিচয় দিই, যদি কোনোভাবে প্রমাণ করতে পারি আমি চোর ডাকাত ছেলেধরা না তাহলে কি কথা বলবে?”

“কীভাবে প্রমাণ করবেন?”

রিফাত হাসান পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করলেন, সেখান থেকে তার কার্ড বের করে গাববুর হাতে দিয়ে বললেন, “এই যে আমার কার্ড। এখানে আমার নাম লেখা আছে। আমার ইউনিভার্সিটির নাম-”

গাববু মাথা নেড়ে বলল, “যে-কেউ কার্ড বানাতে পারে। আমাদের ক্লাসে একটা ছেলে পড়ে, তার নাম বন্টু, সেও একটা কার্ড বানিয়েছে, কার্ডে কী লিখেছে জানেন?”

“কী?”

“ফেমাস ফিল্মস্টার।” গাববু মুখ গম্ভীর করে বলল, “সেইজন্যে কার্ডকে বিশ্বাস করা ঠিক না। তাছাড়া-”

“তা ছাড়া কী?”

“এই যে মানিব্যাগটা আপনি বের করলেন, সেটা যে আপনার মানিব্যাগ তার কী প্রমাণ আছে?”

“মানে আমি অন্য কারও মানিব্যাগ নিয়ে এসেছি? পকেটমার?”

“আমি সেটা বলছি না, কিন্তু কোনো তো প্রমাণ নাই।”

রিফাত হাসান এই পাগলাটে ছেলেটার কথা শুনে মজা পেতে শুরু করেছেন। হাসি গোপন করে বললেন, “তুমি ঠিকই বলেছ, কোনো প্রমাণ নাই। যদি আজকের পত্রিকাটা থাকত তাহলে অবশ্যি প্রমাণ করতে পারতাম।”

গাববু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, “কীভাবে?”

“আজকের পত্রিকায় আমার ছবি বের হয়েছে।”

রিফাত হাসানের কথা শুনে গাববু একটু সরে গিয়ে বসল। রিফাত হাসান জিজ্ঞেস করলেন, “কী হল? তুমি একটু সরে গেলে কেন?”

“আপনি বলেছেন পত্রিকায় আপনার ছবি বের হয়েছে। সেইজন্যে। পত্রিকায় সবসময় মার্ডারার আর সন্ত্রাসীর ছবি বের হয়।”

রিফাত হাসান চোখ কপালে তুলে বললেন, “আমাকে দেখে কি মার্ডারার আর সন্ত্রাসী মনে হয়?”

গাববু কিছুক্ষণ রিফাত হাসানের দিকে তাকিয়ে রইল, চোখে চশমা, মাথায় আধপাকা চুল, মুখের কোনায় একটু হাসি, ঝকমকে চোখ। বলল, “নাহ্।”

রিফাত বিশাল একটা পরীক্ষায় পাস করেছেন সে রকম ভাব করে বললেন, “থ্যাংকু! তুমি যদি বলতে আমার চেহারা মার্ডারার আর সন্ত্রাসীর মতো তাহলে আমার খুব মন খারাপ হতো।”

গাববু গম্ভীর গলায় বলল, “চেহারার উপরে মানুষের কোনো হাত নাই।”

“তা ঠিক।”

“আমাদের ক্লাসে সবচেয়ে সুন্দর চেহারা মিলির। আর মিলি হচ্ছে সারা ক্লাসের মাঝে সবচেয়ে পাজি।”

রিফাত হাসান মাথা নেড়ে বললেন, “ইন্টারেস্টিং।”

গাববু কোনো কথা বলল না এবং দুইজন চুপ করে বসে রইল। হঠাৎ রিফাত হাসানের কিছু একটা মনে পড়ল, সোজা হয়ে বসে বললেন, “ইউরেকা।”

গাববু রিফাত হাসানের দিকে তাকাল, রিফাত হাসান বললেন, “আমার কাছে একটা স্মার্ট ফোন আছে, সেটা দিয়ে ইন্টারনেট ব্রাউজ করা যায়। উইকিপিডিয়াতে আমার ওপর একটা পেজ আছে, আমি যদি সেখানে গিয়ে আমার পেজটা দেখাই তাহলে কি তুমি বিশ্বাস করবে?”

“ছবি আছে আপনার?”

“মনে হয় আছে।”

রিফাত হাসান পকেট থেকে তার স্মার্ট ফোন বের করে সেটাকে টেপাটেপি করতে লাগলেন এবং কিছুক্ষণের মাঝেই উইকিপিডিয়াতে তার ছবিসহ একটা পেজ চলে এল। রিফাত হাসান দেখালেন, “এই দেখো আমার ছবি। এই দেখো ছবির নিচে আমার নাম, আমি যে ইউনিভার্সিটিতে পড়াই তার নাম। দেখেছ?”

গাববু মাথা নাড়ল।

“এখন বিশ্বাস হয়েছে যে আমি ডাকাত কিংবা ছেলেধরা না?”

গাববু আবার মাথা নাড়ল।

“এখন আমরা কথা বলতে পারি?”

গাববু আবার মাথা নাড়ল, বলল, “পারি।”

রিফাত হাসান গাববুর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, “আমার নাম রিফাত হাসান। আমেরিকার একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াই। আমেরিকাতে যারা আছে তারা অবশ্যি কেউই আমার নামটা ঠিক করে উচ্চারণ করতে পারে না। বলে ডিফাট।”

গাববু হাত মিলিয়ে বলল, “ডিফাট?”

হ্যাঁ। ওরা ত উচ্চারণ করতে পারে না। আসলে শুনতেও পারে না। তুমি যদি বল বোতল ওরা শুনতে পায় বোটল।

“সত্যি?”

“হ্যাঁ। সত্যি বললে ওরা শুনবে সটি।”

“কী মজা।”

রিফাত হাসান বললেন, “আমি তো আমার পরিচয় দিলাম, এখন তোমার পরিচয়টা জানতে পারি?”

“আমার নাম গাববু। আমার আরেকটা ভালো নাম আছে, সেটা অনেক লম্বা। গাববুটাই ভালো, মনে রাখা সোজা।”

“গাববু?”

“হ্যাঁ।”

“ভেরি ইন্টারেস্টিং নেম। তুমি যদি আমেরিকা যাও তাহলে তোমার নামটাও মনে হয় ঠিক করে উচ্চারণ করতে পারবে না। বলবে ঘ্যাভু।”

“ঘ্যাভু?”

“হ্যাঁ। যাই হোক, এখন তুমি বল তুমি কেন এত উঁচু একটা গাছ থেকে লাফ দিয়েছ।”

“সেটা আপনি বুঝবেন না।”

“বুঝব না?”

“না।”

“কেন?”

গাববু মাথা নেড়ে বলল, “এটা হচ্ছে বিজ্ঞানের ব্যাপার। বিজ্ঞান না জানলে এটা বোঝা যায় না। আমি আববু, আম্মু, আপু সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি, কেউ বুঝতে পারে নাই। আপনিও বুঝবেন না।”

“বুঝতেও তো পারি।”

“উঁহু। অনেক কঠিন। এটা বুঝতে হলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, ভর, ওজন এইসব বুঝতে হয়।”

রিফাত হাসান কষ্ট করে মুখে গাম্ভীর্য ধরে রেখে বললেন, “ও আচ্ছা, তাহলে আমি আন্দাজ করার চেষ্টা করি তুমি কেন গাছের ওপর থেকে লাফ দিয়েছ?”

গাববু অবাক হয়ে রিফাত হাসানের দিকে তাকালেন, “আপনি আন্দাজ করবেন? করেন দেখি।”

রিফাত হাসান হাসি হাসি মুখ করে বললেন, “ফ্রি ফলের সময় মানুষের নিজেকে মনে হয় কোনো ওজন নেই। তুমি তাই গাছ থেকে লাফ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছ ওজন না থাকলে কেমন লাগে।”

গাববু অবাক হয়ে রিফাত হাসানের দিকে তাকিয়ে রইল, চোখ বড় বড় করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, “কী আশ্চর্য! আপনি কেমন করে আন্দাজ করলেন? আমি কত চেষ্টা করে কাউকে বোঝাতে পারি নাই, আর আপনি নিজে নিজে বুঝে গেলেন!”

“তোমার কথা কেউ বিশ্বাস করে না?”

“না। উল্টো আমাকে নিয়ে ইয়ারকি করে।”

রিফাত হাসান মাথা নাড়লেন, বললেন, “আমি জানি। সায়েন্টিস্টদের কথা কেউ বুঝতে চায় না। তাদের জীবন খুবই কঠিন। আগে অবস্থা আরও অনেক খারাপ ছিল, পুড়িয়ে মেরে ফেলত। এখন অবস্থা একটু ভালো, আর পুড়িয়ে মারে না। বড়জোর গালাগাল দেয়।”

গাববু হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, বলল, “না, অবস্থা বেশি ভালো হয় নাই। দুই-দুইবার আমার ল্যাবরেটরিটা নালায় ফেলে দিয়েছিল।”

“খুবই অন্যায হয়েছে।”

“এক্সপেরিমেন্ট করার সময় একটু ভুল তো হতেই পারে। একটু আগুন লেগেছে, জানালার পর্দা অগ্নি একটু পুড়েছে। ব্যস! সবাই রেগে মেগে ফায়ার। আমার পুরা ল্যাবরেটরি নালায়। কত মূল্যবান কেমিক্যালস ছিল। ইশ!”

রিফাত হাসান সমবেদনার ভঙ্গি করে বলল, “ইশ! খুবই অন্যায হয়েছে। খুবই অন্যায।”

ঠিক এই সময় রিফাত হাসানের টেলিফোন বাজল, টেলিফোন করেছে ইউসুফ, ভয় পাওয়া গলায় বলল, “স্যার, আপনি কোথায়?”

রিফাত হাসান বললেন, “আমি এখন খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে ব্যস্ত আছি। তোমার সাথে একটু পরে কথা বলি?”

ইউসুফ বলল, “ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে।” সে টেলিফোন বন্ধ করে হোটেলের রিসেপশনিস্ট মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলল, “স্যার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজে ব্যস্ত আছেন।”

মেয়েটি বলল, “গুরুত্বপূর্ণ মানুষ তো গুরুত্বপূর্ণ কাজেই ব্যস্ত থাকেন। এত মানুষ দেখা করতে চাইছে সবাইকে তো সময়ও দিতে পারেন না। নিশ্চয়ই কাউকে সময় দিয়েছেন।”

“কে হতে পারে?” ইউসুফ মাথা চুলকালো।

“প্রাইম মিনিস্টার? প্রেসিডেন্ট?”

“বুঝতে পারছি না। কারও সাথে যোগাযোগ না করে একা বের হয়ে গেছেন, খুব দুশ্চিন্তা লাগছে।”

মেয়েটি অপরাধীর মতো বলল, “স্যারকে সার্ভিস ডোর দিয়ে বের করে দেওয়াটা মনে হয় বুদ্ধিমানের কাজ হয় নাই। কী করব-এমনভাবে বলছিলেন যে না করতে পারলাম না।”

ইউসুফ চিন্তিত মুখে বলল, “ভেরি রিস্কি। স্যার যখন ইউরোপ যান তখন স্যারের প্রোটেকশনের জন্যে স্পেশাল স্কোয়াড থাকে, আর আমরা এখানে স্যারকে একা একা ছেড়ে দিলাম। স্যার স্কুটার রিকশা করে চলে গেলেন। কী সর্বনাশ!”

মেয়েটি মাথা নেড়ে বলল, “মনে হচ্ছে ভুলটা আমারই হয়েছে।”

“না, না, আপনার ভুল হয় নি। স্যার এডাল্ট মানুষ, কিছু একটা করতে চাইলে তো নিষেধ করতে পারি না। কাল থেকে পুলিশ স্কোয়াডের ব্যবস্থা করব। কোথায় আছেন কে জানে তাহলে এখনই পুলিশ নিয়ে যেতাম।”

“গুরুত্বপূর্ণ কোনো মানুষের সাথে যখন কথা বলছেন, মনে হয় নিরাপদেই আছেন।”

ঠিক এরকম সময় রিফাত হাসানের সাথে “গুরুত্বপূর্ণ” মানুষটির আলাপ খুব জমে উঠেছে।

গাববু জিজ্ঞেস করেছে, “আপনি কী করেন?”

রিফাত হাসান বলল, “বলতে পার আমিও তোমার লাইনের লোক। এই তোমার মতো একটু-আধটু বিজ্ঞানের কাজ করি।”

গাববু কিছুক্ষণ রিফাত হাসানের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, “বেশি সুবিধে করতে পারেন নাই। তাই না?”

রিফাত হাসান খতমত খেয়ে বললেন, “কেন? তোমার এটা কেন মনে হল?”

“সত্যিকারের সায়েন্টিস্টদের একটা চেহারা থাকে, আপনার সেই চেহারাটা এখনো আসে নাই।”

“সেটা কী রকম চেহারা?”

গাববু নিজের চুল এলোমেলো করে দেখিয়ে দিয়ে বলল, “লম্বা লম্বা উষ্ণুষ্ণু চুল। আর বড় বড় মোছ।”

“তাই নাকি?”

“হ্যাঁ। আইনস্টাইনের লম্বা লম্বা চুল। নিউটনের লম্বা লম্বা চুল, গ্যালিলিওর লম্বা লম্বা চুল। সব সায়েন্টিস্টদের লম্বা লম্বা চুল থাকে। আপনি যদি বড় সায়েন্টিস্ট হতে চান তাহলে লম্বা লম্বা চুল রাখা শুরু করে দেন।”

“ঠিক আছে। রিফাত হাসান রাজি হওয়ার ভঙ্গি করে বললেন, “তোমার কাছ থেকে অনেক বড় একটা জিনিস শিখে নিলাম। লম্বা চুল এবং সম্ভব হলে বড় বড় গোঁফ।” হঠাৎ করে তাঁর কিছু একটা মনে হল, মাথা ঘুরিয়ে গাববুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “আচ্ছা, মেয়েরা তো সাধারণত লম্বা লম্বা চুল রাখে, তাহলে তারা কি আরও সহজে বড় বিজ্ঞানী হতে পারবে?”

গাববু ইতস্তত করে বলল, “সেইটা তো কখনো চিন্তা করি নাই। মনে হয় পারবে। কিন্তু চুল লম্বা হলেই তো হবে না, উষ্ণুষ্ণু থাকতে হবে। মেয়েরা কখনো চুল উষ্ণুষ্ণু রাখতে চায় না। সেইখানে মনে হয় সমস্যা হয়।”

রিফাত হাসান মুখে কষ্ট করে একটা গাম্ভীর্য ধরে রেখে বললেন, “তুমি বিজ্ঞানের আর কী কী জানো?”

“অনেক কিছু জানি।”

“কয়েকটা বল দেখি।”

গাববু কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, “বিজ্ঞানের গবেষণা করার সময় আগে থেকে কাউকে সেটা বলবেন না।”

“কেন?”

“কারণ তারা গবেষণার কিছু বুঝে না, আর সেটা নিয়ে হাসাহাসি করে। আর যদি কাজ না করে তাহলে সারাংশ টিটকারি মারবে। আমি একবার একটা রকেট বানিয়েছিলাম, সেটা কেন জানি উপরে না উঠে নিচে ডাইভ মেরেছিল, তারপর সেটা নিয়ে কী হাসাহাসি কী টিটকারি। দেখা হলেই বলে, এই গাববু, তোর রকেটের খবর কী? এখনো মাটির নিচে যায়?”

রিফাত হাসান বললেন, “খুবই অন্যায় কথা।”

গাববু হঠাৎ করে ঘুরে রিফাত হাসানকে জিজ্ঞেস করল, “আপনি এখানে কেন এসেছেন?”

“আমি যখন ছোট ছিলাম তখন এখানে থাকতাম। তাই জায়গাটা আবার দেখতে এসেছি, কতটুকু আগের মতো আছে, কতটুকু পাল্টে গেছে।”

“আগের মতন কি আছে?”

রিফাত হাসান মাথা নাড়লেন, বললেন, “না। মোটেও আগের মতন নাই। চারিদিকে খালি বিল্ডিং আর বিল্ডিং। এই মাঠটার জন্যে এখনো চিনতে পেরেছি। তুমি যে গাছ থেকে লাফ দিয়েছ, আমিও এই গাছ থেকে লাফ দিতাম।”

“আপনাদের বাসাটা কোথায় ছিল?”

রিফাত সামনে দেখিয়ে বলল, “ঐ যে ছয়তলা দালানটা দেখছ, ওখানে আগে ছোট একটা দুইতলা বিল্ডিং ছিল, আমরা সেইখানে থাকতাম। ডানপাশে একটা টিনের ছাদওয়ালা ছোট বাড়ি ছিল, এখন সেখানে ন’দশ তলা বিল্ডিং! থ্যাংক গড, এই মাঠটা এখনো খালি আছে।”

গাববু বলল, “বেশিদিন খালি থাকবে না। এইখানে নাকি একটা বারোতলা শপিং কমপ্লেক্স হবে।”

রিফাত হাসান মাথা নেড়ে বললেন, “হাউ স্যাড! কী দুঃখের ব্যাপার।”

গাববু হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করল, “আপনি কী নিয়ে গবেষণা করেন?”

“তুমি কী নিয়ে গবেষণা করো?”

“অনেক কিছু। যেমন মনে করেন, টিকটিকির লেজ পড়ে গেলে আরেকটা লেজ গজায়। তাহলে এমন কি হতে পারে আসল লেজটা পড়ার আগেই নতুন একটা লেজ গজালো! তার মানে তখন এক টিকটিকির দুই লেজ!”

রিফাত হাসান হাসলেন, বললেন, “ভেরি ইন্টারেস্টিং।”

“তারপর মনে করেন আমার আরেকটা গবেষণা হচ্ছে টেলিপ্যাথি নিয়ে। আপনি টেলিপ্যাথির নাম শুনেছেন?”

“শুনেছি। একজনের চিন্তা আরেকজনের মাথায় পাঠিয়ে দেওয়া।”

গাববুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, এই প্রথম সে একজন মানুষকে পেয়েছে যে নিজে থেকে টেলিপ্যাথি বিষয়টা জানে। এর আগে সবাইকে তার বিষয়টা বোঝাতে হয়েছে এবং কাউকেই সে আসলে বোঝাতে পারে নি এবং সবাই উল্টো তাকে এটা নিয়ে ঠাট্টা করেছে। গাববু উত্তেজিত গলায় বলল, “দুইজন যদি অনেকদূরে বসে একই সময় একইভাবে চিন্তা করে তাহলে একজনের চিন্তাটা আরেকজনের মাথায় পাঠানো যায়। চিন্তা করতে হয় এইভাবে-” বলে গাববু চোখ বন্ধ করে দুই হাত দিয়ে দুই কান চেপে ধরে ভুরু কুঁচকে গভীরভাবে চিন্তা করার একটা ভঙ্গি করল।

রিফাত হাসান কষ্ট করে হাসি চেপে রেখে মুখে একটা গম্ভীর ভাব ধরে রেখে বললেন, “তুমি কি টেলিপ্যাথি করার চেষ্টা করে দেখেছ যে এটা কাজ করে?”

গাববু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “কেমন করে পরীক্ষা করব? কাউকে রাজি করাতে পারি না। অনেক কষ্ট করে আপুকে রাজি করিয়েছিলাম। আপু চিন্তা না করে খালি হাসে। হাসলে কেমন করে হবে?”

টেলিপ্যাথি জাতীয় বিষয়গুলো যে আসলে বিজ্ঞানের বিষয় নয়, এগুলো যে বিজ্ঞানের নাম ব্যবহার করে অবৈজ্ঞানিক চিন্তা প্রচার করার একটা চেষ্টা, বিষয়টা গাববুকে জানাতে গিয়েও রিফাত হাসান থেমে গেলেন। গাববুর এত উত্তেজনার মাঝে ঠান্ডা পানি ঢেলে দিতে ইচ্ছে করল না, আধপাগল এই বাচ্চাটার মাঝে যদি সত্যিকারের একটা বৈজ্ঞানিক মন থাকে তাহলে সে নিজেই একদিন বিষয়টা বুঝে নেবে।

“এই জন্যে এখনো টেলিপ্যাথির গবেষণাটা শেষ করতে পারি নাই।” গাববু বলল, “কেউ টেলিপ্যাথি করতে রাজি হয় না।”

“এত ইন্টারেস্টিং গবেষণা তার পরেও কেউ রাজি হয় না?”

হঠাৎ করে গাববুর চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে, রিফাত হাসানের দিকে তাকিয়ে বলল, “আপনি করবেন?”

রিফাত হাসান চমকে উঠলেন, “আমি?”

“হ্যাঁ। আপনি আর আমি।”

“আ-আ-আমাকে কী করতে হবে?”

“কিছু না, খুবই সোজা। প্রত্যেকদিন ঠিক রাত দশটার সময় আপনি চোখ বন্ধ করে কান চেপে ধরে চিন্তা করে আমাকে কোনো একটা খবর পাঠাবেন।”

“খবর-মানে ম্যাসেজ?”

“হ্যাঁ। আমিও পাঠাব। দেখব ম্যাসেজ যায় কি না।”

“ম্যাসেজটা গিয়েছে কি না সেটা কেমন করে বুঝব?”

গাববু বলল, “ম্যাসেজটা পেলেই বুঝবেন সেটা গিয়েছে। না বোঝার কী আছে?”

“ও আচ্ছা।”

গাববু আশা নিয়ে জিজ্ঞেস করল, “করবেন এক্সপেরিমেন্ট?”

রিফাত হাসান নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলেন না যখন শুনলেন যে গাববুকে বলছেন, “ঠিক আছে।” আমেরিকায় তার ইউনিভার্সিটির তার বন্ধু-বান্ধব ছাত্রছাত্রী যদি এটা শুনে তাহলে তারা নিশ্চয়ই হাসতে হাসতেই মরে যাবে।

গাববু তার সবগুলো দাঁত বের করে হেসে বলল, “রাত দশটা। প্রত্যেকদিন।”

প্রফেসর হাসান মাথা নাড়লেন, বললেন, “ঠিক আছে। যদি মনে থাকে।”

“আমি আপনাকে মনে করিয়ে দেব।”

“কেমন করে মনে করিয়ে দেবে?”

“কেন? টেলিপ্যাথি দিয়ে!”

রিফাত হাসান বললেন, “ও আচ্ছা! ঠিক আছে। হ্যাঁ মনে করিয়ে দিয়ো।”

ঠিক এরকম সময় দূরের মসজিদ থেকে আজানের শব্দ শোনা যেতে লাগল। গাববু তখন উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “আজান পড়ে গেছে। যেতে হবে।”

“ঠিক আছে বিজ্ঞানী গাববু। যাও।”

গাববু যেতে যেতে দাঁড়িয়ে গেল, বলল, “সবাই যদি আপনার মতো বিজ্ঞানের ব্যাপার-স্যাপার বুঝত, তাহলে কী যে ভালো হতো!”

“সবাইকে দোষ দিয়ে আর কী হবে? সবাই তো আর তোমার কিংবা আমার মতো বিজ্ঞান করে না। কেমন করে বুঝবে?”

“আপনি কী নিয়ে গবেষণা করেন সেটা তো বললেন না?”

“আমার গবেষণা মোটেও তোমার মতো ইন্টারেস্টিং না। তোমার তুলনায় খুবই বোরিং। রীতিমতো হাস্যকর।”

গাববু উদারভাবে বলল, “তাতে কী আছে! তবু শুনি?”

রিফাত হাসান বললেন, “আমি এক্সপেরিমেন্ট দিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করি। এক্সপেরিমেন্টের পর অনেক ডাটা পাওয়া যায়, সেই ডাটা এনালাইসিস করে একটা পার্টিকেল খুঁজি।”

“কেমন করে খোঁজেন?”

“পার্টিকেলটা থাকলে তার কিছু বৈশিষ্ট্য থাকবে। ডাটাগুলোর মাঝে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজি।”

গাববু বুঝে ফেলার ভঙ্গি করে বলল, “বুঝেছি।”

গাববুর কথা শুনে রিফাত হাসান খতমত খেয়ে গেলেন। তাঁর যে কাজ সেটা গাববুর মতো দশ-বারো বছরের বাচ্চার বোঝার কথা নয়। তাই একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “বুঝেছ?”

“হ্যাঁ। আসলে আমিও এরকম একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছিলাম, একটু অন্যভাবে।”

গাববুর কথা শুনে রিফাত হাসান কৌতুক অনুভব করলেন, বললেন, “তুমিও এই রকম এক্সপেরিমেন্ট করেছ?”

“হ্যাঁ। অন্যভাবে।”

“কীভাবে?”

গাববু মুখে এক ধরনের গাষ্ঠীর্ষ নিয়ে এসে বলল, “আমাদের একজন স্যার আছেন, হাকিম স্যার। খুবই কড়া। সমাজপাঠ পড়ান। পরীক্ষার আগে সবাই চিন্তা করছে স্যার কী রকম প্রশ্ন করবেন। ক্লাসের সবাই স্যারের আগের প্রশ্ন নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে, সেগুলো দেখে আন্দাজ করার চেষ্টা করেছে স্যার এইবার কী প্রশ্ন করবেন। আর আমি কী করেছি জানেন?”

“কী?”

“আমি করেছি ঠিক তার উল্টো।”

“উল্টো।”

“হ্যাঁ। হাকিম স্যার আগে কী প্রশ্ন করেছেন সেটা দেখার চেষ্টা না করে আমি দেখার চেষ্টা করলাম স্যার আগে কোন কোন প্রশ্ন করেন নাই! শুধু সেইগুলো পড়ে পরীক্ষা দিয়েছি। চোখ বন্ধ করে এ প্লাস!”

রিফাত হাসান অবাক হয়ে দশ-বারো বছরের এই আধা পাগল ছেলেটার দিকে তাকিয়ে রইলেন, বাচ্চাটা ছেলেমানুষি ভঙ্গিতে তার সামনে হঠাৎ একটা আশ্চর্য সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। এক্সপেরিমেন্টাল পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে তার আর তার দলের সবার জীবনের বড় একটা অংশ কাটে এক্সপেরিমেন্টের ডাটা ঘেঁটে। কেমন করে এই ডাটা বিশ্লেষণ করা হবে তার ওপর নির্ভর করে কত তাড়াতাড়ি তারা তাদের এক্সপেরিমেন্টের ফলাফল প্রকাশ করতে পারেন। এই ছেলেটি সম্পূর্ণ নতুনভাবে ডাটা বিশ্লেষণের একটা পদ্ধতি বলে দিয়েছে-এত সহজ এত চমৎকার একটা পদ্ধতির কথা তার মাথায় কেন আসে নি রিফাত হাসান সেটা ভেবে অবাক হয়ে গেলেন।

গাববু আকাশের দিকে তাকাল, তারপর বলল, “আমি যাই।” রিফাত হাসান বললেন, “দাঁড়াও গাববু। এক সেকেন্ড দাঁড়াও।”

গাববু মাথা নাড়ল, বলল, “উঁহু দাঁড়ানো যাবে না। আমাদের বাসার নিয়ম হচ্ছে আজান হওয়ার সাথে সাথে বাসায় রওনা দিতে হবে।”

“কিন্তু তোমার জানা দরকার তুমি আমাকে অসাধারণ একটা আইডিয়া দিয়েছ।”

“লাভ নাই।” গাববু হতাশার ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বলল, “আমাকে বাসায় যেতেই হবে।”

রিফাত হাসান বললেন, “ডাটাতে একটা নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য না খুঁজে আমরা এখন তোমার টেকনিক ব্যবহার করতে পারি। কোনটা নেই সেটা খুঁজতে পারি। অসাধারণ আইডিয়া।”

বিষয়টা নিয়ে গাববুকে খুব উত্তেজিত হতে দেখা গেল না। বলল, “আমার এখন যেতে হবে।”

“এক সেকেন্ড। প্লিজ।”

“উঁহু।” গাববু হাঁটতে হাঁটতে বলল, “বাসায় দুশ্চিন্তা করবে।”

রিফাত হাসান ব্যস্ত হয়ে বললেন, “আমি যদি তোমার সাথে যোগাযোগ করতে চাই?”

“টেলিপ্যাথি”। গাববু গম্ভীর গলায় বললেন, “টেলিপ্যাথি করে আমার কাছে একটা ম্যাসেজ পাঠিয়ে দিবেন।”

রিফাত হাসান অবাক হয়ে গাববুর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

৬

গাববু হেঁটে হেঁটে মাঠটা পার হয়ে ছোট রাস্তাটায় ওঠার পর দেখতে পেল উল্টোদিক দিয়ে টুনি আর মিঠু হেঁটে আসছে। গাববুকে দেখে টুনি বলল, “ঠিক আছিস? ঠ্যাং ভাঙে নাই তো?”

গাববু মুখ শক্ত করে বলল, “ঠ্যাং ভাঙবে কেন?”

মিঠু বলল, “যদি গাছ থেকে লাফ দাও।”

টুনি বলল, “আম্মু আমাদেরকে পাঠিয়েছে তুই গাছপালা থেকে লাফাচ্ছিস কি না সেটা দেখার জন্য।”

গাববু কোনো কথা না বলে হাঁটতে লাগল। টুনি বলল, “এতক্ষণ কী করছিলি?”

“কিছু না।”

“কিছু না মানে?”

“কথা বলছিলাম।”

“কার সাথে কথা বলছিলি?”

“এই তো একজনের সাথে।”

“কী নিয়ে কথা বলছিলি?”

“বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে।”

টুনি বলল, “তুই রাস্তাঘাটের মানুষের সাথে বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে কথা বলছিস?”

“মোটোও রাস্তাঘাটের মানুষ না। ইউনিভার্সিটির প্রফেসর।”

“ইউনিভার্সিটির প্রফেসরদের আর কাজ নাই তোর সাথে বৈজ্ঞানিক গবেষণা নিয়ে কথা বলবে।”

গাববুর তর্ক করার ইচ্ছা করল না, তাই সে কোনো কথা বলল না। টুনি বলল, “কী নাম ইউনিভার্সিটির প্রফেসরের?”

“ডেফাট।”

“ডেফাট? ডেফাট কারও নাম হতে পারে না।”

গাববু বোঝানোর চেষ্টা করল, “আমেরিকানরা ডাকে ডেফাট। আসল নাম অন্যকিছু।”

“আসল নাম কী?”

“জানি না, ভুলে গেছি।” তখন হঠাৎ করে গাববুর মনে পড়ল তার পকেটে একটা কার্ড আছে, বলল, “দাঁড়াও, আমার কাছে একটা কার্ড আছে।” গাববু পকেট থেকে কার্ডটা বের করে নামটা পড়ল, “প্রফেসর রিফাত হাসান।”

টুনি কেমন যেন চমকে উঠল, গাববুর হাত থেকে কার্ডটা প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে পড়ে একটা আতর্জিৎকার করল।

গাববু অবাক হয়ে বলল, “কী হয়েছে?”

টুনি কথা বলতে পারল না, তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে যায়, নাক দিয়ে বড় বড় নিঃশ্বাস বের হতে থাকে। দেখে মনে হয় বুঝি এস্কুনি অজ্ঞান হয়ে যাবে। গাববু ভয়ে ভয়ে বলল, “কী হয়েছে আপু?”

টুনি কেমন যেন তোতলাতে তোতলাতে বলল, “তু-তু-তুই বিজ্ঞানী রিফাত হাসানের সাথে কথা বলছিলি? বি-বিজ্ঞানী রি-রি রিফাত হাসান? রিফাত হাসান? রি-রি-রিফাত হাসান?”

গাববু খতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করল, “রিফাত হাসান কে?”

টুনি কেমন জানি খেপে উঠল, “তুই রিফাত হাসানকে চিনিস না? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক রিফাত হাসান? তিন দিনের জন্যে বাংলাদেশে এসেছেন!”

“ও।”

“কোথায় আছেন এখন?”

“ওই তো বেঞ্চে বসে আছেন!”

টুনি একটা চিৎকার করল, “বসে আছেন? এখনো বসে আছেন? কোথায়?” তারপর গাববুর উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে ছুটতে লাগল।

গাববু পেছনে পেছনে আসে, টুনি মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, “কোন বেঞ্চে?”

গাববু বলল, “ঐ তো ঐ বেঞ্চে ছিলেন।”

“এখন কই?”

“মনে হয় চলে গেছেন।”

“চলে গেছেন?” টুনি হাহাকারের মতো শব্দ করল, “চলে গেছেন?”

গাববু বলল, “আমার সাথে আরেকটু কথা বলতে চাচ্ছিলেন, আমি বললাম সময় নাই-”

টুনি কেমন যেন পাগলের মতো হয়ে গেল, গাববুকে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, “তুই প্রফেসর রিফাত হাসানকে বলেছিস তোর কথা বলার সময় নাই? কথা বলার সময় নাই?”

গাববু বলল, “সময় না থাকলে আমি কী করব?”

টুনি দুই চোখ কপালে তুলে গাববুর দিকে তাকিয়ে রইল। সে এখনো গাববুর কথা বিশ্বাস করতে পারছে না। টুনি গাববুকে ছেড়ে দিয়ে এদিক-সেদিক তাকায়, মাঠের পাশ দিয়ে রাস্তা পর্যন্ত ছুটে যায়, রাস্তার লোকজনকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, তারপর হতাশ হয়ে ফিরে আসে।

বাসায় ঢুকেই টুনি চিৎকার করে বলল, “আববু আম্মু, তোমরা শুনে যাও, তোমাদের ছেলে কী করেছে।”

আববু আম্মু শঙ্কিত মুখে জিজ্ঞেস করলেন, “কী করেছে?”

গাববুকে তখন পুরো ঘটনাটা খুলে বলতে হল। সবকিছু শুনে আববু বললেন, “তুই এত বড় একজন বিজ্ঞানীকে বললি যে তার সাথে কথা বলবি না? অপরিচিত মানুষের সাথে তুই কথা বলিস না?”

গাববু মাথা নাড়ল, বলল, “হ্যাঁ। তুমিই তো সবসময় বল অপরিচিত মানুষের সাথে কথা না বলতো।”

“তাই বলে প্রফেসর রিফাত হাসানের মতো এত বড় একজন বিজ্ঞানীর মুখের উপর সেই কথা বলে দিলি?”

“উনি আমার কথা শুনে কিছু মনে করেন নাই।”

“কেমন করে জানিস?”

“তখন আমাকে কার্ড দিলেন। আমি যখন বললাম, আমি কার্ড বিশ্বাস করি না তখন-”

টুনি আত্ননাদ করে উঠল, “উনি তোকে একটা কার্ড দিলেন আর তুই বললি তুই সেই কার্ড বিশ্বাস করিস না?”

“সমস্যাটা কী? তখন স্মার্ট ফোনে ইন্টারনেট দিয়ে তার ওয়েবসাইট দেখালেন, তখন আমি বিশ্বাস করলাম।”

আম্মু বলল, “যখন বিশ্বাস করলি তখন বাসায় নিয়ে এলি না কেন?”

গাববু বলল, “চিনি না শুনি না রাস্তার একজন মানুষকে বাসায় নিয়ে আসব?”

টুনি গাববুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, কষ্ট করে নিজেকে সামলে নিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, “রাস্তার মানুষ? প্রফেসর রিফাত হাসান রাস্তার মানুষ?”

মিঠু বলল, “ভাইয়া, তুমি প্রফেসর রিফাত হাসানকে চিনতে পারলে না? টেলিভিশনে সবসময় দেখাচ্ছে।”

টুনি বলল, “নামটাও জানিস না? যখন কার্ডটা দিলেন তখন কার্ডের পেছনে একটা অটোগ্রাফ নিতে পারলি না?”

“অটোগ্রাফ?” গাববু অবাক হয়ে বলল, “অটোগ্রাফ?”

“হ্যাঁ। চিন্তা করতে পারিস নিজের কার্ডের পেছনে তাঁর অটোগ্রাফ?”

“অটোগ্রাফ দিয়ে কী করব?”

টুনি হাত দিয়ে কপালে একটা থাবা দিয়ে বলল, “গাধাটা বলে অটোগ্রাফ দিয়ে কী করব! যদি শুধু বাসায় নিয়ে আসতে পারতি তাহলে ফটো তুলতে পারতাম। চিন্তা করা যায়? প্রফেসর রিফাত হাসানের সাথে ফটোগ্রাফ?”

মিঠু জিজ্ঞেস করল, “ভাইয়া, উনি তোমার সাথে কী নিয়ে কথা বলেছেন?”

“তুই বুঝবি না। বিজ্ঞানের ব্যাপার-স্যাপার।”

আববু ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, “তোর সাথে বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলেছেন?”

“হ্যাঁ। তোমরা তো আমার কোনো কথাই শুনতে চাও না। উনি সবকিছু শুনেছেন। আমার সব কথা বিশ্বাস করেছেন। টিকটিকির ডাবল লেজের আমার যে থিওরিটা আছে সেইটা সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেছেন।”

টুনি জানতে চাইল, “তুই কেমন করে বুঝতে পারলি?”

“আমাকে বলেছেন?”

“কী বলেছেন?”

“বলেছেন তোমার সাথে বিজ্ঞানের থিওরিটা নিয়ে একটু কথা বলি।”

“আর তুই বলেছিস তোর সময় নাই?”

আম্মু মাথা নেড়ে বললেন, “হায় হায় হায়! এত বড় একজন মানুষ, এত বড় বিজ্ঞানী, তার সাথে তুই এত বড় বেয়াদবি করলি? এই দেশ নিয়ে কী একটা ধারণা নিয়ে ফিরে যাবেন! ভাববেন এই দেশের সব মানুষ বুঝি তোর মতো বোকা। কান্ডজ্ঞান নাই।”

আববু একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, “এত বড় মানুষ, তুই তাকে চিনলি না?”

মিঠু বলল, “আমি পর্যন্ত চিনি।”

টুনি প্রফেসর রিফাত হাসানের কার্ডটার দিকে তাকিয়ে বলল, “এইখানে টেলিফোন নম্বরগুলো আমেরিকার। ইশ! যদি দেশের একটা মোবাইল নম্বর থাকত তাহলে ফোন করতে পারতাম। কোনোভাবে যদি একবার যোগাযোগ করা যেত।”

গাববু বলল, “আমার সাথে আজ রাতে যোগাযোগ হবে।”

একসাথে সবাই লাফিয়ে উঠল, “যোগাযোগ হবে?”

“হ্যাঁ।”

টুনি চিৎকার করে উঠল, “এতক্ষণ বলিস নি কেন? কীভাবে যোগাযোগ হবে?”

“টেলিপ্যাথি।”

যোগাযোগ শুনে যেভাবে সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল, টেলিপ্যাথি শুনে সবার উত্তেজনা ঠিক সেইভাবে শেষ হয়ে গেল। টুনি হতাশ হয়ে বলল, “টেলিপ্যাথি? গাধা তুই একটা মোবাইল নম্বর নিতে পারলি না?”

গাববু মুখ শক্ত করে বলল, “যখন টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ কাজ করা শুরু করবে তখন দেখো মোবাইল টেলিফোনের বিজনেসের বারোটা বেজে যাবে।”

মিঠু জিজ্ঞেস করল, “টেলিপ্যাথি দিয়ে মিসকল দেওয়া যাবে?”

গাববু বলল, “ধুর গাধা! তখন মিসকল দিতে হবে না।”

আববুকে একটু বিভ্রান্ত দেখা গেল, “উনি টেলিপ্যাথি বিশ্বাস করেন?”

গাববু মাথা চুলকে বলল, “এখনো হ্যাঁ না কিছু বলেন নাই। কিন্তু বিজ্ঞানের ব্যাপার-স্যাপার সবসময় পরীক্ষা করে দেখতে হয়। আমরা ঠিক করেছি প্রত্যেকদিন রাত দশটার সময় টেলিপ্যাথি করার চেষ্টা করব?”

টুনি চোখ কপালে তুলে বলল, “প্রত্যেকদিন?”

“হ্যাঁ।”

“গাধা তুই টেলিপ্যাথি না বলে টেলিফোন কেন বললি না?”

গাববু মুখ শক্ত করে বলল, “টেলিফোন খুবই পুরনো জিনিস। দুইশ বছর আগে আবিষ্কার হয়েছে। টেলিপ্যাথি নতুন-এখনো আবিষ্কার হয় নাই।”

ঠিক এই সময় রিফাত হাসান হোটেলের রুমে বসে তার সহকর্মীদের কাছে একটা ই-মেইল পাঠাচ্ছিলেন। ই-মেইলটি এই রকম :

আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস জানানোর জন্যে তোমাদের কাছে এই ই-মেইলটি পাঠাচ্ছি। আমাদের পুরো সময়টি কাটে বিশাল পরিমাণ ডাটা এনালাইসিস করে, সেখান থেকে ছোট একটা সিগনেচার খুঁজে বের করতে আমাদের পুরো জীবনটা কেটে যায়। কাজটা কত সময়সাপেক্ষ সেটা তোমাদের থেকে ভালো করে আর কেউ জানে না।

আজ বিকেলে একজন সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে ডাটা এনালাইসিস করার একটা চমকপ্রদ উপায় দেখিয়ে দিয়েছে। পদ্ধতিটা খুবই সহজ, এককথায় এইভাবে বলা যায়, কী আছে সেটা না খুঁজে কী নেই সেটা খোঁজা। এখানে বসে আমি ডাটাবেসে ঢুকতে পারছি না, যদি পারতাম তাহলে এক্ষুনি পরীক্ষা করে দেখতাম। তোমরা কেউ একজন ডাবল ব্রাঞ্চিং ডাটাতে কোথায় কোথায় পেয়ার প্রডাকশন নেই আমাকে জানাও।

তোমরা শুনে খুবই মজা পাবে, আমাকে যে এই চমকপ্রদ আইডিয়াটি দিয়েছে সে দশ-বারো বছরের পাগলাটে একটা ছেলে, তার নাম গাববু। এই বয়সেই সে খাঁটি বৈজ্ঞানিক। তার সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সে আমাকে তার কো-পার্টনার করেছে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উদ্দেশ্য শুনলে তোমাদের খুবই মজা পাওয়ার কথা, সেটি হচ্ছে টেলিপ্যাথি। হা হা হা।

রাত দশটার সময় তোমরা যদি আমাকে ফোন করে আবিষ্কার করো আমি ফোনটি ধরছি না তাহলে বুঝে নেবে আমি তার সাথে টেলিপ্যাথিক যোগাযোগ করার এক্সপেরিমেন্ট নিয়ে ব্যস্ত আছি। হা হা হা।

রাত দশটার সময় রিফাত হাসান যখন সত্যি সত্যি তার সব কাজ ফেলে রেখে গাববুর দেখানো পদ্ধতিতে চোখ বন্ধ করে দুই কানে হাত দিয়ে টেলিপ্যাথি করার চেষ্টা করছেন তখন গাববুও বাসা থেকে একই কাজ করছে। মিঠু খুব কাছে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে গাববুকে দেখছিল, গাববু কয়েক মিনিট চেষ্টা করে যখন চোখ খুলল তখন মিঠু জিজ্ঞেস করল, “হয়েছে ভাইয়া? টেলিপ্যাথি হয়েছে?”

গাববু হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, “নাহ। আমি কোনো ম্যাসেজ পাই নাই, আমার ম্যাসেজটা পেয়েছেন কি না বুঝতে পারলাম না।”

“তুমি কী ম্যাসেজ পাঠিয়েছো?”

“ইম্পরট্যান্ট ম্যাসেজ। স্টপ। চুল দাড়ি মোছ ছাড়াও বড় বিজ্ঞানী হওয়া সম্ভব। স্টপ। উদাহরণ ডারউইন। স্টপ। মাথা ভরা টাক। স্টপ।”

মিঠু অবাক হয়ে গাববুর দিকে তাকিয়ে রইল।

৭

পরদিন সকালে মাথায় ঠান্ডা পানি না ঢেলেও গাববুকে ঘুম থেকে তুলে ফেলা গেল। বাথরুমে গিয়ে গাববু টুথপেস্ট দিয়ে মুখ ধোয়া যায় কিনা পরীক্ষা করে দেখল। পাশে টুনি দাঁড়িয়ে ছিল, অন্যদিন হলে চিৎকার করে বাসা মাথায় তুলে ফেলত, আজকে কিছুই করল না। নাস্তা খাওয়ার সময় গাববু যখন

পানির গ্লাসে চায়ের পাতা ফেলে সারফেস টেনশনের একটা ছোট এক্সপেরিমেন্ট করে ফেলল, তখনো কেউ তাকে কিছু বলল না।

নাস্তা খেতে খেতে আববু খবরের কাগজ পড়ছিলেন, হঠাৎ মাথা তুলে বললেন, “এই যে, রিফাত হাসানের ছবি।”

সবাই ঘুরে তাকাল। প্রথম পৃষ্ঠায় নিচের দিকে তার হাসিমুখের একটা ছবি। টুনি জিজ্ঞেস করল, “কী লিখেছে আববু?”

মিঠু বলল, “ভাইয়ার সাথে দেখা হয়েছে সেইটা কি লিখেছে?”

টুনি মুখ ভেংচে বলল, “আর ভাইয়া যে তার সাথে এক শ’ রকম বেয়াদবি করেছে সেটা লিখেছে?”

আববু হাসলেন, বললেন, “না সেইগুলো কিছু লিখে নি। লিখেছে যে আজকে বিকেলে চলে যাবেন!”

টুনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, “ইশ! একটুর জন্যে দেখা হল না।”

স্কুলে পৌঁছানোর পর গাববু তার ব্যাগটা জানালার কাছে রেখে যখন বের হবে তখন শুনল তাদের ক্লাসের মিলি আর লিটন ঝগড়া করছে। গাববু এ ধরনের ঝগড়াঝাটিকে কোনো গুরুত্ব দেয় না, কিন্তু আজকে গুরুত্ব দিল। কারণ ঝগড়ার বিষয়বস্তুটা বিজ্ঞান-বিষয়ক। গাববু শুনতে পেল লিটন বলছে উত্তল লেন্স দিয়ে কোনোকিছু ছোট দেখা যায়, আর মিলি বলছে বড় দেখা যায়। এরকম বৈজ্ঞানিক একটা আলোচনায় পাশে দাঁড়িয়েও সে অংশ নেবে না সেটা তো হতে পারে না।

গাববুকে দেখে লিটন আর মিলি দুজনেই থেমে গেল, কারণ তারা দুজনেই জানে গাববু এই আলোচনাটাকে টেনে এত লম্বা করে ফেলবে যে তারা সেখানে থেকে আর বের হতে পারবে না। গাববু বলল, “তোদের সমস্যাটা কী?”

লিটন তাড়াতাড়ি বলল, “কোনো সমস্যা নাই।”

মিলিও মাথা নাড়ল, “নাই। সমস্যা নাই।” তারপর দুইজনই ক্লাসরুম থেকে বের হয়ে যেতে শুরু করল।

গাববু বলল, “আমি তোদের কথা শুনেছি। উত্তল লেন্স দিয়ে কোনোকিছুকে বড় দেখা যায় না ছোট দেখা যায় সেটা জানতে চাচ্ছি।”

মিলি বলল, “এখন আর জানতে চাচ্ছি না।” তারপর ক্লাসরুম থেকে বের হয়ে গেল।

গাববু পেছন পেছন হেঁটে গিয়ে বলল, “উত্তল লেন্স হচ্ছে কনভেক্স লেন্স। কনভেক্স লেন্স দিয়ে একটা জিনিস বড়ও দেখা যায়, আবার ছোটও দেখা যায়।”

মিলি এবার দাঁড়িয়ে গেল, ভুরু কুঁচকে পেছনে তাকিয়ে বলল, “একটা লেন্স দিয়ে একইসাথে একটা জিনিস বড় আর ছোট কেমন করে দেখা যাবে? আমার সাথে ফাজলেমি করিস?”

“মোটাই ফাজলেমি করছি না। বড় দেখা যায় যদি জিনিসটা ফোকাল লেন্থের ভেতরে থাকে। ফোকাল লেন্থের বাইরে হলে ছোট হতে পারে।”

মিলিকে লেন্স নিয়ে উৎসাহী হতে দেখা গেল না, সে হেঁটে চলে গেল। লিটন জিজ্ঞেস করল, “সত্যি?”

“হ্যাঁ। ক্যামেরায় ছবি তোলে কীভাবে? কনভেক্স লেন্স দিয়ে। আমরা আমাদের চোখে দেখি কেমন করে? কনভেক্স লেন্স দিয়ে।”

লিটন বলল, “ও।”

“টেলিস্কোপের অবজেক্টিভ লেন্স সবসময় কনভেক্স লেন্স দিয়ে তৈরি করতে হয়। আইপিস কনভেক্সও হতে পারে, কনকেভও হতে পারে।”

লিটন বলল, “ও।”

“আইপিস যদি কনভেক্স হয় সেই টেলিস্কোপে সবকিছু উল্টো দেখা যায়।”

লিটন বলল, “ও।”

“আমাদের বাইনোকুলার আমরা সোজা দেখি। তার মানে কী?” গাববু লিটনের উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করল না, নিজেই বলে দিল, “তার মানে হচ্ছে বাইনোকুলারের আইপিস হচ্ছে কনকেভ লেন্স।”

লিটন বলল, “ও।”

গাববু বলল, “আমার ব্যাগে লেন্স আছে। দেখবি?”

লিটন দুর্বলভাবে বলল, “দেখা।”

গাববু তখন তার ব্যাগ খুলে সেখান থেকে লেন্স খুঁজে বের করতে থাকে। ব্যাগে শুধু লেন্স নয়, সেখানে দুই ধরনের চুম্বক, কয়েলের তার, কয়েকটা ব্যাটারি, কাচের স্লাইড, স্ক্রু ড্রাইভার এলইডি, লিটমাস পেপার, ফিল্মের কৌটা, ভিনেগার, শুকনো পোকামাকড়-এরকম অনেক কিছু আছে। গাববু যখন লেন্সটা খুঁজে বের করেছে তখন লিটন কেটে পড়ার একটা সুযোগ পেল, বলল, “গাববু তুই খুঁজে বের কর। আমি আসছি।” তারপর সেও সটকে পড়ল।

গাববু শেষ পর্যন্ত তার লেন্সটা খুঁজে পেল, লেন্সটা সে জানালার ওপর দাঁড় করিয়ে লিটনকে খুঁজতে বের হল। সে তখনো জানতো না এই লেন্সটা তার কপালে কত বড় বিপদ ডেকে আনবে।

ক্লাসরুম থেকে বের হয়েই গাববু দেখল রবিন মাঠে পড়ে আছে এবং তাকে ঘিরে ছোট একটা ভিড়। রবিন একটু দুষ্ট টাইপের, সারাশরৎই ছোট্টাছুটি করছে এবং আছাড় খেয়ে পড়ে ব্যথা পাচ্ছে। কাজেই তার জন্যে এটা মোটেই নতুন ব্যাপার না। গাববু কাছে গিয়ে দেখে আসলেই তাই, পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে, নাক-মুখ কুঁচকে যন্ত্রণার শব্দ করছে।

রত্না বলল, “নাক চেপে ধর তাহলে ব্যথা কমে যাবে।”

মিলি বলল, “ঠান্ডা পানি খাইয়ে দো।”

লিটন বলল, “গরম সরিষার তেল দিলে ব্যথা কমবে।”

গাববু এরকম অবৈজ্ঞানিক কথা শুনে খুবই বিরক্ত হল, কাছে গিয়ে বলল, “ব্যথা কী? ব্যথা হচ্ছে নার্ভ দিয়ে ব্রেনে পাঠানো একটা অনুভূতি। তাই ব্যথা কমানোর একটাই উপায়, সেটা হচ্ছে নার্ভ দিয়ে ব্যথার অনুভূতিটা পাঠাতে বাধা দেওয়া।”

মিলি বলল, “সেটা কীভাবে করা যায়? কক্ষনোই করা যাবে না।”

গাববু গম্ভীর হয়ে বলল, “অবশ্যই করা যায়। এই নার্ভ দিয়ে সব রকম অনুভূতি যাচ্ছে। কাজেই পায়ে আরও অনেক রকম অনুভূতি তৈরি করতে হবে যেন সবগুলো পাঠাতে গিয়ে ব্যথার অনুভূতিটা কমে যায়।”

“কীভাবে?”

“হাত বুলাতে থাক। সবচেয়ে সোজা।”

রবিন এমনিতেই হাত বুলাচ্ছিল, এবারে আরও কয়েকজন হাত বুলিয়ে দেয়। গাববু গম্ভীর গলায় বলল, “রবিন? ব্যথা কমেছে না?”

রবিন মাথা নাড়ল। গাববু রাজ্য জয় করার ভঙ্গি করে বলল, “দেখেছিস?”

মিলি ঠোঁট উল্টে বলল, “কচু।”

গাববু মুখ শক্ত করে বলল, “আমার কথা বিশ্বাস করলি না? আয় কাছে আয়। দেখাই।”

মিলি জিজ্ঞেস করল, “কী দেখাবি?”

“তোমার হাতটা দো।”

মিলি হাতটা এগিয়ে দেয়, গাববু খপ করে হাতটা ধরে সেখানে একটা চিমটি দিল, সাথে সাথে মিলি “আউ আউ” করে চিৎকার করে লাফাতে থাকে। গাববু এমন কিছু জোরে চিমটি দেয় নি, কিন্তু মিলি এমন ভাব করতে লাগল যে সে ব্যথায় মরে যাচ্ছে।

গাববু বলল, “যেখানে চিমটি দিয়েছি সেখানে হাত বুলা, দেখবি ব্যথা কমে যাবে। নার্ভ দিয়ে-”

মিলি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, “কচু। এত জোরে চিমটি দিয়েছিস, এই দেখ লাল হয়ে গেছে-”

গাববু দেখল, মোটেও সেরকম লাল হয় নি। মিলির গায়ের রঙ ফর্সা আর ফর্সা গায়ের রঙ হলে অল্পতেই লাল হয়। গাববু বলল, “লাল হওয়া মানে বুঝেছিস তো? তার মানে রক্ত জমা হচ্ছে।”

মিলি পা দাপিয়ে বলল, “কছু।” তারপর রেগেমেগে চলে গেল।

তাপস নামে একটা ছেলে পুরো ব্যাপারটা দেখে নি, সে জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে?”

লিটন বলল, “গাববু মিলিকে চিমাটি দিয়েছে।”

তাপস অবাক হয়ে বলল, “কেন? মিলিকে চিমাটি দিলি কেন?”

রত্না বলল, “ব্যথা দেওয়ার জন্যে।”

তাপস আরও অবাক হল, “ব্যথা দেওয়ার জন্যে? গাববু কেন মিলিকে ব্যথা দিচ্ছে?”

গাববু বলল, “আমি মোটেও মিলিকে ব্যথা দেই নাই। আমি মিলিকে দেখাচ্ছিলাম নার্ভের ভেতর দিয়ে ব্যথার অনুভূতি যাওয়ার সময় কীভাবে সেটাকে কমানো যায়।”

“কীভাবে?”

“তোর হাতটা দো।”

তাপস তার হাত বাড়িয়ে দিল, গাববু সেটা ধরে এক জায়গায় চিমাটি দিল। তাপসও “আউ” করে ছোট একটা চিৎকার করল, কিন্তু মিলির মতো লাফঝাপ শুরু করে দিল না। গাববু তখন তাকে দেখাল কেমন করে ব্যথার ওপর হাত বুলিয়ে ব্যথা কমানো যায়।

তাপসের দেখাদেখি আরও কয়েকজন তখন গাববুর দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়। সবাই যে গাববুর কথা বিশ্বাস করল তা না, সেটা নিয়ে গাববু অবশ্যি মাথা ঘামাল না। সে অনেকদিন থেকে দেখেছে, বিজ্ঞানের আবিষ্কার সবাই ব্যবহার করে কিন্তু অনেকেই বিজ্ঞানকে বিশ্বাস করে না। তাদের ক্লাসেই অনেক গাধা আছে যারা ডারউইনের বিবর্তন বিশ্বাস করে না, ভাগ্যিস গাববুর গায়ে সে রকম জোর নেই আর সে খুব মারপিট করার মানুষ না, তা না হলে ক্লাসে এই নিয়ে খুনোখুনি হয়ে যেত।

আজকের দিনটি অন্যরকম। কারণ ক্লাসরুমের দরজার আড়ালে গাববু একটা গোবদা মাকড়সা পেয়ে গেল, বহুদিন থেকে সে একটা বড় মাকড়সা খুঁজছে। ব্ল্যাক উইডো স্পাইডার নামে এক ধরনের বিষাক্ত মাকড়সা আছে যার কামড় খেলে মানুষ মরে পর্যন্ত যায়, কিন্তু এই দেশের মাকড়সা সেরকম না। মাকড়সার আঁটটা পা, চোখও অনেকগুলো, বিষয়টা সে এখনো নিজে ভালো করে দেখে নি।

গোবদা মাকড়সাটা একবারও সন্দেহ করে নি যে কেউ তাকে ধরে ফেলবে, তাই সেটা পালানোর চেষ্টা করল না, গাববু খপ করে সেটাকে ধরে ফেলল। গাববুর হাতের মাঝে মাকড়সাটা কিলবিল করতে লাগল, ছুটে পালানোর চেষ্টা করল, গাববু ছাড়ল না। পথেঘাটে এরকম মহামূল্যবান জিনিস

পেলে সেগুলো রাখার জন্যে তার ব্যাগে নানারকম শিশি বোতল কৌটা থাকে, কাজেই গাববু ক্লাসরুমে ঢুকে তার ব্যাগের কাছে গেল। ঠিক তখন তার সাথে রত্নার দেখা হল এবং গাববু বুঝতে পারল সে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা এক্সপেরিমেন্ট করার সুযোগ পেয়েছে।

রত্না মাকড়সাকে অসম্ভব ভয় পায়। ছোট থেকে ছোট মাকড়সা দেখেও সে ভয়ে-আতঙ্কে চিৎকার করতে থাকে, গাববু যে গোবদা মাকড়সাটাকে ধরেছে সেটা দেখলে রত্না নির্ঘাত হার্টফেল করবে। গাববু যে মাকড়সাটাকে ধরে রেখেছে রত্না তখনো সেটা দেখেনি। গাববু মাকড়সা ধরে রাখা হাতটা পেছনে রেখে জিজ্ঞেস করল, “রত্না, তুই পাইয়ের মান কত পর্যন্ত জানিস?”

“পাই?”

“হ্যাঁ।”

“বেশি না, তিন দশমিক এক চার পর্যন্ত।”

“তুই কি আরও বেশি জানতে চাস?”

রত্না ঠোঁট ওল্টাল, বলল, “আমি কিছু মনে রাখতে পারি না।”

“আমি তোকে দশমিকের পর নয় ঘর পর্যন্ত শিখিয়ে দেব?”

“কীভাবে?”

“তুই শিখতে চাস কি না বল?”

রত্না মাথা নাড়ল, বলল, “ঠিক আছে।”

গাববু তখন মাকড়সা ধরা হাতটা রত্নার সামনে নিয়ে আসে, আর রত্না আতঙ্কে রক্তশীতল করা একটা চিৎকার দিল। রত্নাকে দেখে মনে হল সে বুঝি ভয়ের চোটে মারাই যাবে, পেছনে ছুটে যেতে গিয়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

গাববু মাকড়সাটাকে রত্নার নাকের সামনে ধরে বলল, “তিন দশমিক এক চার এক পাঁচ নয় দুই ছয় পাঁচ চার।”

রত্না চিৎকার করে ওঠে। গাববু ঠান্ডা গলায় বলল, “চিৎকার করবি না, আমি কী বলি মন দিয়ে শোন, তিন দশমিক এক চার এক পাঁচ নয় দুই ছয় পাঁচ চার ... তিন দশমিক এক চার এক পাঁচ নয় দুই ছয় পাঁচ চার ...”

মানুষ যেভাবে মন্ত্র পড়ে গাববু সেইভাবে দশমিকের পর নয় ঘর পর্যন্ত পাইয়ের মান উচ্চারণ করতে লাগল। ক্লাসের সবাই কিছুক্ষণ এই বিচিত্র দৃশ্যটি দেখল, তারপর গাববুকে টেনে সরিয়ে নিয়ে রত্নাকে উদ্ধার করল।

গাববু তার ব্যাগে একটা কৌটার মাঝে আধমরা মাকড়সাটাকে রেখে কৌটার মুখ বন্ধ করল। ফারিয়া মুখ বিকৃত করে জিজ্ঞেস করল, “কী করছিস? এই মাকড়সাটাকে কৌটার মাঝে ঢুকালি কেন?”

“পালব।”

“পালবি? মাকড়সা পালবি?”

“হ্যাঁ।”

“ছিঃ।”

“এর মাঝে ছিঃ এর কী আছে?”

“মাকড়সাও একটা পালার জিনিস হল?”

“তুই যদি তোর শরীরে কোটি কোটি ব্যাক্টেরিয়া পালতে পারিস তাহলে আমি একটা মাকড়সা পালতে পারব না?”

ফারিয়া রেগেমেগে বলল, “আমি কখনো আমার শরীরে ব্যাক্টেরিয়া পালি না।”

“পালিস।”

“পালি না।”

“সবাই পালে। মানুষের শরীরে যতগুলো কোষ তার থেকে অনেক বেশি আছে ব্যাক্টেরিয়া।”

“সত্যি?” ফারিয়া অবাক হয়ে বলল, “আমাদের শরীরে ব্যাক্টেরিয়া থাকে?”

“হ্যাঁ, ভালো ভালো ব্যাক্টেরিয়া আমাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করে।”

ফারিয়া বলল, “তাই বলে মাকড়সা তো থাকে না-” তারপর মাথা ঝটকা দিয়ে চলে গেল এবং ফারিয়া যখন মাথা ঝটকা দিল তখন গাববু দেখল ফারিয়ার মাথায় কত লম্বা চুল। হাইথ্রোমিটার বানানোর জন্যে সে যদি একগোছা এরকম লম্বা চুল পেত কী চমৎকার হতো। সে ফারিয়ার পিছু পিছু গেল, “ফারিয়া। ফারিয়া।”

“কী হয়েছে?”

“তোর কী সুন্দর লম্বা চুল।”

ফারিয়া জানে তার সুন্দর লম্বা চুল, মেয়েরা সেটা সবসময় লক্ষ্য করে, কিন্তু কোনো ছেলে কখনো সেটা লক্ষ্য করে নি। ফারিয়া অবাক হল যে শেষ পর্যন্ত সেটা একটা ছেলের চোখে পড়েছে এবং কী আশ্চর্য এই ছেলেটা হচ্ছে গাববু!

ফারিয়া একটু লাজুক ভঙ্গিতে হেসে বলল, “হ্যাঁ। আমার চুল অনেক লম্বা।”

“আমাকে একটু দিবি?”

ফারিয়া গাববুর কথা ঠিক বুঝতে পারল না, বলল, “কী দিব?”

“তোর চুল।”

“চুল? চুল দিব? চুল কীভাবে দেয়?”

“কেটে?”

গাববু তার সুন্দর লম্বা চুল লক্ষ করেছে শুনে একটু আগে তার ভেতরে যে একটু ভালো অনুভূতি হয়েছিল, এখন তার পুরোটা দূর হয়ে সেখানে একটা খাটোভাব তৈরি হল। ফারিয়া রেগেমেগে বলল, “তুই জানিস যে তোর মাথা খারাপ?”

“দে না। প্লিজ। একটু।”

“দূর হ।”

গাববু দূর হল না, সে ফারিয়ার পিছনে লেগে রইল, আর শেষ পর্যন্ত ত্যক্তবিরক্ত হয়ে ফারিয়া তাকে কয়েকটা চুল দিতে রাজি হল। সাথে সাথে গাববু এক দৌড়ে তার ব্যাগ থেকে একটা কাঁচি নিয়ে চলে আসে।

ফারিয়া চোখ কপালে তুলে বলল, “কাঁচি কেন?”

“চুল কাটার জন্যে।”

“কতগুলো কাটবি?”

“বেশি না, শুনে শুনে দশটা।”

চুল শুনে শুনে কাটা যায় কি না সেটা এখনো কেউ জানে না এবং আট নম্বর চুলটা কাটার সময় ফারিয়া আবার মাথায় একটা ঝটকা দিল আর তখন তার মাথার একগোছা চুল কাটা পড়ল।

ফারিয়ার মাথায় অনেক চুল, কাজেই যেখানে একগোছা চুল কাটা পড়েছে সেই জায়গাটা সহজেই ঢেকে রাখা যায় কিন্তু একটু চুল সরালেই ফাঁকা জায়গাটা চোখে পড়ে। ফারিয়ার যা মেজাজ খারাপ হল সেটা বলার মতো না, কিন্তু তখন কী করবে!

ক্লাসের ঘণ্টা পড়ার পর রত্না ভয়ে ভয়ে ক্লাসে ঢুকল। গাববু তার ব্যাগের ভেতর একটা জ্যাস্ট মাকড়সা রেখে দিয়েছে, সেটা চিন্তা করেই তার বুক ধুকধুক করছে। গাববুর বেঞ্চ থেকে অনেক দূরে গিয়ে বসে সে চিৎকার করে বলল, “গাববু, তোকে আমি খুন করে ফেলব।”

গাববু একটু অবাক হয়ে বলল, “কেন?”

“তুই জানিস না কেন? তুই জানিস না আমি মাকড়সাকে ভয় পাই? আমাকে মাকড়সা দিয়ে ভয় দেখাস?”

গাববু আরও একটু অবাক হয়ে বলল, “কিন্তু আমি তো ভয় দেখানোর জন্যে মাকড়সা দেখাই নি। মানুষ ভয় পাওয়ার সময় তার সামনে যেটা হয় সেটা মনে রাখে। সেইজন্যে দশমিকের পর নয় ঘর পাইয়ের মান বলছিলাম, লক্ষ করিস নি?”

পাইয়ের মান নিয়ে রত্নার খুব একটা মাথাব্যথা দেখা গেল না। সে হিংস্র গলায় বলল, “আমি প্রিন্সিপাল স্যারের কাছে নালিশ করব।”

গাববু বলল, “কিন্তু কিন্তু-”

“আমি থানায় তোর বিরুদ্ধে মামলা করব।”

গাববু বলল, “কিন্তু আমি-”

“তোর আববু-আম্মুর কাছে নালিশ করব।”

গাববু বলল, “আসলে হয়েছে কী জানিস, মানুষের ব্রেনের মাঝে-”

ভয় পেলে মানুষ কেমন করে সেটা মনে রাখে বিষয়টা গাববু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তার মাঝে ক্লাসে রওশন ম্যাডাম ঢুকে গেলেন বলে সে আর ব্যাখ্যা করতে পারল না।

ক্লাস শুরু হওয়ার পর গাববু হঠাৎ করে বুঝতে পারল একদিনের জন্যে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বেশি হয়ে গেছে, সত্যি সত্যি যদি রত্না কিংবা ফারিয়া কিংবা মিলি কিংবা আর কেউ স্যার ম্যাডাম কিংবা প্রিন্সিপালের কাছে নালিশ করে দেয় তাহলে সে বিপদে পড়ে যাবে।

গাববু তখনো জানত না যে সে আসলে বিপদে পড়ে গিয়েছে।

৮

সকালবেলা গাববু ক্লাসরুমে মিলি আর লিটনকে কনভেক্স লেঙ্গ নিয়ে জ্ঞান দান করছিল এবং বিষয়টা হাতেকলমে দেখানোর জন্যে তার বিশাল লেঙ্গটা জানালার ওপর রেখে তাদের খুঁজতে গিয়েছিল। বাইরে নানা ধরনের উত্তেজনার কারণে তার আর লেঙ্গটার কথা মনে নেই। ধীরে ধীরে বেলা হয়েছে এবং সূর্যটা ওপরে উঠেছে এবং মনে হয় ঠিক গাববুকে বিপদে ফেলার জন্যেই বিশাল কনভেক্স লেঙ্গের ঠিক ফোকাল পয়েন্টে জানালার পর্দাটা বসানো হয়েছে।

রওশন ম্যাডামের ক্লাস যখন মাঝামাঝি পৌঁছেছেন ঠিক তখন সূর্যের আলো কনভেক্স লেঙ্গের কারণে কেন্দ্রীভূত হয়ে জানালার পর্দায় আগুন লাগিয়ে দিল। সস্তা সিনথেটিক কাপড়, কিছু বোঝার আগে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। ক্লাসের ছেলেমেয়েরা চিৎকার করতে করতে বের হয়ে আসে, গাববু সাথে সাথে বুঝে গেল কী হয়েছে, তাই লেঙ্গটা না নিয়ে সে বের হতে চাইছিল না, কিন্তু তাকেও

ঠেলে বের করা হল। মাঠে সব ছেলেমেয়েরা গাববুকে ঘিরে দাঁড়াল, চিৎকার করে বলল, “গাববু! তুই এখন কী করেছিস? কী করেছিস বল।”

এরকম একটা আগুন যে গাববু ছাড়া আর কেউ লাগাতে পারে না সেটা নিয়ে কারও মনে এতটুকু সন্দেহ ছিল না। গাববু আমতা আমতা করতে করতে বলল, “আমার কনভেক্স লেঙ্গটা জানালার ওপর রেখেছিলাম। মনে হয়-, মনে হয়-”

সূর্যের আলোকে কেন্দ্রীভূত করে আগুন ধরিয়ে ফেলার মতো তাপ সৃষ্টি করে ফেলা যায় বিজ্ঞানের এত সুন্দর বিষয়টা কারও চোখে পড়ল না। মাঠে সব ছেলেমেয়েরা যখন চেষ্টামেচি করছে ঠিক তখন দেখা গেল গাববুদের ক্লাসরুমের আগুন নিভিয়ে প্রিন্সিপাল স্যার বের হয়ে আসছেন, ডান হাতে যে জিনিসটা ধরে রেখেছেন গাববু দূর থেকেই সেটাকে চিনতে পারল, তার বড় কনভেক্স লেঙ্গটা, যেটা সে জানালার ওপর রেখে এসেছিল।

খাটো প্রিন্সিপাল লম্বা লম্বা পা ফেলে তাদের দিকে এগিয়ে এলেন, লেঙ্গটা ওপরে তুলে জিজ্ঞেস করলেন, “এটা কার?”

এমনভাবে জিজ্ঞেস করলেন যে শুনে মনে হল হাতে যেটা ধরে রেখেছেন সেটা একটা গ্রেনেড কিংবা মেশিনগান কিংবা আধা কেজি পটাশিয়াম সাইনাইড।

গাববু বলল, “আমার।” নিজের জিনিসটা নেওয়ার জন্যে সে হাত বাড়াল, প্রিন্সিপাল স্যার লেঙ্গটা ফেরত না দিয়ে হাত সরিয়ে নিয়ে বললেন, “ও! আমাদের রেগুলার ক্রিমিনাল! তোমার?”

“জি স্যার।”

“ঘরে আগুন লাগানোর জন্যে জানালায় ফিট করেছ?”

“না স্যার। মিলি আর লিটন কনভেক্স লেঙ্গ নিয়ে কথা বলছিল-”

“খবরদার।” প্রিন্সিপাল স্যার খেকিয়ে উঠলেন, “নিজের বদমাইশির সাথে অন্যদের জড়াবে না। আর কী কী করেছ তুমি?”

“কিছু করি নাই স্যার।”

“নিশ্চয়ই করেছ। বল কী করেছ?”

“কিছু করি নাই।”

প্রিন্সিপাল স্যার এবারে ক্লাসের ছেলেমেয়েদের দিকে তাকালেন, বললেন, “কী করেছে তোমরা বল।”

কেউ কোনো কথা বলল না। প্রিন্সিপাল স্যার এবার ধমক দিয়ে বললেন, “কী করেছে বল।”

লিটন একটু ইতস্তত করে বলল, “গাববু তো একটু পাগল কিসিমের, তাই সবসময়েই কিছু-না-কিছু করছে।”

“কী করেছে?”

“এই তো-”

“এই তো মানে?”

মিলি বলল, “যেমন চিমাটি কাটা-”

প্রিন্সিপাল স্যার চিৎকার করে বললেন, “চিমাটি কেটেছে? এই মিচকি শয়তান চিমাটি কাটে? কত বড় সাহস? আর কী করে?”

গাববু আবিষ্কার করল প্রিন্সিপাল স্যার ধমকাধমকি করে কিছুক্ষণের মাঝে ফারিয়ার চুল কাটা থেকে শুরু করে রত্নাকে মাকড়সা দিয়ে ভয় দেখানো পর্যন্ত সবগুলো ঘটনা বের করে ফেললেন। তার মুখে এবারে কেমন যেন একটা আনন্দের ছাপ পড়ল, তার মুখের দুই পাশের ধারালো কেনাইন দাঁত দুটো বের করে হিংস্র মুখে বললেন, “মিচকে শয়তান! তোমার দিন শেষ! ফিনিস।”

গাববু বলল, “আ-আমার?”

“হ্যাঁ। তোমার কত বড় সাহস, তুমি আমাকে হাইকোর্ট দেখাও? এখন আমি তোমাকে হাইকোর্ট দেখাব।”

গাববু বলল, “হাইকোর্ট? আমাকে?”

প্রিন্সিপাল স্যার মাথা ঝাকালেন, কিন্তু যেহেতু তার গলা নেই, শরীরের ওপর মাথাটা সরাসরি বসানো, তাই মাথাটা খুব বেশি নড়ল না। সেই অবস্থায় হিস হিস শব্দ করে বললেন, “আমি তোমার বাবা-মা’কে ডেকে পাঠাচ্ছি, তারপর তাদের হাতে তোমাকে তুলে দিব। তারা তোমাকে নিয়ে যা ইচ্ছা তা-ই করতে পারবেন।”

গাববু বলল, “যা ইচ্ছা?”

“হ্যাঁ। যা ইচ্ছা।”

৯

স্কুল থেকে টেলিফোন পেয়ে আববু আর আম্মু দুজনেই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন, তাদের তিনজন ছেলেমেয়ে এই স্কুলে পড়ে, তাই প্রথমেই তাদের মনে হয়েছে যে তাদের কারও কিছু একটা হয়েছে। স্কুল থেকে বলা হল তার ছেলেমেয়ের কারও কিছু হয় নি, তাদের ডাকা হয়েছে সম্পূর্ণ অন্য কোনো

কারণে। কারণটা কী টেলিফোনে তাদের বলা হয় নি, কিন্তু আবু বা আম্মু কারোই কারণটা অনুমান করতে কোনো সমস্যা হয় নি।

স্কুলে এসে প্রিন্সিপালের অফিসে ঢুকে দেখলেন তাদের অনুমান সত্যি। প্রিন্সিপাল তাদের দুইজনকে দেখে মুখটা কালো করে ফেললেন, তারপর হতাশভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগলেন। প্রিন্সিপাল সাইজে ছোট, ধড়ের ওপর মাথাটা সরাসরি বসানো এই বর্ণনাটা তাদের ছেলেমেয়ের কাছ থেকে অনেকবার শুনেছেন, আজকে নিজের চোখে দেখলেন।

আবু বললেন, “স্কুল থেকে আমাদের দুইজনকে ডেকে পাঠিয়েছেন?”

“হ্যাঁ। আপনারা গাববুর বাবা-মা?”

“জি।”

“বসেন।”

আবু আর আম্মু বসলেন। আবু কেশে গলাটা একটু পরিষ্কার করে বললেন, “আপনি আমাদের কেন ডেকে পাঠিয়েছেন আমরা বিষয়টা একটু অনুমান করতে পারছি। বিষয়টা নিশ্চয়ই গাববুকে নিয়ে তার কোনো একটা এক্সপেরিমেন্ট-”

প্রিন্সিপাল আবুকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বললেন, “না, না। আপনাদের সবকিছু জানা দরকার। নিজের চোখে দেখা দরকার, নিজের কানে শোনা দরকার। বাবা মায়েরা সবসময় ভাবে তাদের ছেলেমেয়েরা হচ্ছে ফিরেশতা, তারা কোনো ভুল করতে পারে না। তাদের ধারণা, আমরা শিক্ষকেরা তাদের ছেলেমেয়েদের ওপর অবিচার করি।”

আবু বললেন, “না, না। আমরা কখনোই সেটা ভাবি না।”

প্রিন্সিপাল গলা উঁচিয়ে বললেন, “ভাবেন। নিশ্চয়ই ভাবেন। সেইজন্যে আমি আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছি। নিজের চোখে দেখেন, নিজের কানে শোনেন আপনার ছেলে কী করেছে।”

আম্মু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “কী করেছে গাববু?”

প্রিন্সিপাল একটা কাগজ তুলে বললেন, “এই যে এখানে লেখা আছে। শুধু আজকের ঘটনা, এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়-ছয়টা ঘটনা। বলতে পারেন ছয়টা ক্রিমিনাল অফেন্স।”

আম্মু চোখ কপালে তুলে বললেন, “ক্রিমিনাল অফেন্স?”

“অবশ্যই। আপনার ছেলে যদি ছোট না হয়ে বড় হতো তাহলে এতক্ষণে পুলিশ ধরে নিয়ে যেত।”

আম্মু খাবি খেলেন, “আমাদের গাববুকে পুলিশে ধরে নিয়ে যেত?”

“আমার কথা বিশ্বাস করার দরকার নেই। নিজের চোখে দেখেন, নিজের কানে শোনেন।”
প্রিন্সিপাল স্যার তখন গলা উঁচিয়ে একজন মানুষকে ডেকে বললেন রওশন ম্যাডাম, তার ক্লাসের ছেলেমেয়ে আর গাববুকে ডেকে আনতে।

কিছুক্ষণের মাঝেই প্রথমে গাববু, তার ক্লাসের বেশ কয়েকজন ছেলেমেয়ে এবং সবার শেষে রওশন ম্যাডাম প্রিন্সিপালের রুমে ঢুকলেন। রওশন ম্যাডাম একটা চেয়ারে বসলেন। গাববু এবং তার ক্লাসের সব ছেলেমেয়ে এক কোনায় জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রিন্সিপাল স্যার গলা উঁচিয়ে বললেন, “গাববু, তুমি মাঝখানে দাঁড়াও।”

গাববু মাঝখানে দাঁড়াল, সে তার বড় চশমার ভেতর দিয়ে ভয়ে ভয়ে একবার আববু-আম্মুর দিকে তাকিয়ে তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে ফেলল।

আববু বললেন, “এই ছেলেমেয়েদের এখানে ডেকে আনার কোনো দরকার ছিল না। আপনার যা বলার কথা সোজাসুজি আমাদেরকে বলতে পারতেন।”

প্রিন্সিপাল স্যার বললেন, “না। আমি চাই সবাই শুনুক। জানুক। আমাদের কী সমস্যা হচ্ছে সেটা আপনারা সবাই জানেন।”

“আমি খুবই দুঃখিত যে আমার ছেলের কারণে আপনার স্কুলে সমস্যা হচ্ছে। আমি কথা দিচ্ছি আমি ব্যাপারটা দেখব।”

আম্মুও মাথা নাড়লেন, বললেন, “হ্যাঁ। আমরা ব্যাপারটা দেখব।”

“সেটা পরের ব্যাপার। আগে দেখা যাক তার বিরুদ্ধে কী কী অভিযোগ রয়েছে।” প্রিন্সিপাল স্যার কাগজটা তার নাকের কাছে নিয়ে পড়লেন, “এক-দুই-তিনজনকে সে ব্যথা দিয়েছে।”

আম্মু চমকে উঠলেন, “ব্যথা দিয়েছে?” আম্মু গাববুকে খুব ভালোভাবে জানেন, তাকে নিয়ে হাজার রকম যন্ত্রণা থাকতে পারে, কিন্তু সে কাউকে ব্যথা দিতে পারে সেটা তিনি কোনোভাবে বিশ্বাস করতে পারেন না। বললেন, “গাববু কাউকে ব্যথা দিতে পারে সেটা আমার বিশ্বাস হয় না।”

প্রিন্সিপাল স্যার বললেন, “আমার কথা বিশ্বাস না হলে আপনি নিজেই আপনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন।”

আম্মু জিজ্ঞেস করলেন, “গাববু, তুই কাউকে ব্যথা দিয়েছিস?”

গাববু দুর্বল গলায় বলল, “আম্মু, ব্যথা দিয়েছি একটা এক্সপেরিমেন্ট করার জন্য?”

“কী এক্সপেরিমেন্ট?”

গাববু এক্সপেরিমেন্টটা ব্যাখ্যা করল, কেন কীভাবে চিমটি দিয়েছে সেটা বোঝালো। সবকিছু শুনে আববু বলল, “তাই বলে তুই একজনকে ব্যাথা দিবি?”

প্রিন্সিপাল স্যার মনে করিয়ে দিলেন, “একজনকে নয়। তিনজনকে। দুইজনকে চিমটি, একজনকে রুলার দিয়ে গুঁতো।”

গাববু নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। বোঝা গেল অভিযোগ সত্যি। প্রিন্সিপাল স্যার কাগজ দেখে বললেন, “দ্বিতীয় অভিযোগ অনেক গুরুতর। তুমি একটা মেয়ের মাথার চুল কেটে নিয়েছ?”

গাববু কোনো কথা বলল না। প্রিন্সিপাল স্যার ধমক দিয়ে বললেন, “কথা বল।”

গাববু তখন কথা বলল, “হাইথ্রোমিটার বানানোর জন্যে আমার লম্বা চুল দরকার। কেউ দিতে রাজি হয় না, তখন ফারিয়াকে অনেক কষ্ট করে রাজি করিয়েছি?”

“আর তার মাথার চুল কেটে নিয়েছ?”

“সব না। অল্প কয়েকটা।”

“মোটোও অল্প কয়েকটা না, এক খাবলা চুল কেটে নিয়েছ। আমি নিজের চোখে দেখেছি।”

গাববু একটা নিঃশ্বাস ফেলল, “যখন কাটছিলাম তখন নড়ে উঠল, তাই-”

“কার চুল কেটেছ? নাম কী?”

“ফারিয়া।”

“ফারিয়া কোথায়? সামনে এসো।”

ফারিয়া সামনে এসে দাঁড়াল। প্রিন্সিপাল স্যার হুঙ্কার দিলেন, “তোমার মাথার কাটা চুল দেখাও।”

ফারিয়া ভয়ে ভয়ে তার মাথার চুল সরিয়ে দেখাল এক জায়গায় এক খাবলা চুল নেই। গাববু বলল, “ফারিয়া তুই চাইলে আমি তোর চুলগুলো তোকে দিয়ে দিতে পারি।”

ফারিয়া বলল, “আমি কাটা চুল দিয়ে এখন কী করব?”

প্রিন্সিপাল কাগজটা আবার তুললেন, “এর পরের অভিযোগটা আরও গুরুতর। গাববু ক্লাসের এক ছাত্রীকে এমন ভয় দেখিয়েছে যে মেয়েটা প্রায় মেন্টাল কেস হয়ে গেছে।”

আববু-আম্মু কথাটা শুনে এত অবাক হলেন যে বলার মতো না। তারা একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকালেন।

প্রিন্সিপাল স্যার ডাকলেন, “যে মেয়েটিকে ভয় দেখিয়েছে সে কোথায়? সামনে এসো।”

রত্না দুই পা এগিয়ে গেল। প্রিন্সিপাল স্যার বললেন, “এবারে বল কী হয়েছে। কোনোকিছু বাদ দেবে না।”

রত্না কোনো কথা না বলে দাঁড়িয়ে রইল। প্রিন্সিপাল স্যার হস্কার দিলেন, “কী হল? কলাগাছের মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? কথা বল।”

রত্না তখন শুরু করল, “ক্লাসের সবাই জানে আমি মাকড়সাকে খুব ভয় পাই। খু-উ-ব বেশি ভয় পাই। গাববু সেটা জানে। সকালবেলা এত বড় একটা মাকড়সা হাত দিয়ে ধরে আমার মুখের সামনে ধরেছে।”

প্রিন্সিপাল স্যারের চোখগুলো আনন্দে জ্বলজ্বল করতে থাকে। রত্নাকে বললেন, “কী হয়েছে? থামলে কেন? বল। বলতে থাকো।”

রত্না বলল, “মাকড়সাটা যখন ধরেছে তখন আমি ভয়ে চিৎকার করছি। আর গাববু তখন বলছে তিন দশমিক এক চার এক পাঁচ নয় দুই ছয় পাঁচ চার-”

গাববুর মুখ হঠাৎ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে হাতে কিল দিয়ে বলল, “পেরেছে! পেরেছে!”

প্রিন্সিপাল স্যার ভুরু কুঁচকে তাকালেন, “কী পেরেছে?”

“পাইয়ের মান দশমিকের পর নয় ঘর পর্যন্ত বলতে পেরেছে। আগে পারত না।”

“আমি কিছুই বুঝতে পারছি না তুমি কী বলছ?”

গাববু বিষয়টা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল, “রত্না অনেক বার বলেছে সে কিছু মনে রাখতে পারে না। চেষ্টা করলেও ভুলে যায়। আমি তখন তাকে বলেছি আমি তাকে মনে রাখা শিখিয়ে দেব, পাইয়ের মান নয় ঘর পর্যন্ত সে মনে রাখতে পারবে। এখন দেখেছেন স্যার সে নয় ঘর পর্যন্ত গড়গড় করে বলে গেল।”

প্রিন্সিপাল স্যার মেঘস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, “তার সাথে মাকড়সা দিয়ে ভয় দেখানোর কী সম্পর্ক?”

গাববু অনেকটা লেকচার দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল, “মানুষ যখন ভয় পায় তখন ব্রেনের যে অংশটা কাজ করে তার নাম হচ্ছে এমিগডালা। ভয় পাওয়ার সময় যে ঘটনা ঘটে মানুষের ব্রেন সেটা খুব ভালো করে মনে রাখতে পারে। সেইজন্যে আমি রত্নাকে যখন পাইয়ের মানগুলো বলছিলাম তখন একইসাথে মাকড়সা দিয়ে ভয় দেখাচ্ছিলাম। এমিগডালা কাজ করেছে স্যার, রত্নার সব মনে আছে। সাকসেসফুল এক্সপেরিমেন্ট।”

প্রিন্সিপাল স্যার চোখ লাল করে বললেন, “তুমি বলতে চাও যে এত বড় একটা অন্যায় করেও তোমার ভেতরে কোনো অপরাধবোধ নেই?”

গাববু ইতস্তত করে বলল, “স্যার, এইটা একটা সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট ছিল স্যার। অন্যায় ছিল না স্যার।”

“অন্যায় ছিল না? তাহলে এই লিস্টের শেষ ঘটনাটা কী ছিল? যখন তুমি তোমার ক্লাসরুমের পর্দায় আগুন লাগিয়ে দিলে? সারা স্কুলে হইচই ছোট্টাছুটি কেলেঙ্কারি? আমি নিজে জানালা থেকে এই ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা উদ্ধার করেছি।” কথা শেষ করে প্রিন্সিপাল স্যার ড্রয়ার থেকে বড় একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস বের করে দেখালেন। প্রিন্সিপাল স্যার হুঙ্কার দিলেন, “কী ছিল সেই ঘটনা?”

গাববু বলল, “এইটাও সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট। আর একটু অ্যাকসিডেন্ট।”

“কোনটা এক্সপেরিমেন্ট? কোনটা অ্যাকসিডেন্ট?”

গাববু তখন তার নিজের মতো করে বোঝানোর চেষ্টা করল কীভাবে কনভেক্স লেন্সের বিষয়টা দেখানোর জন্যে সে একটা এক্সপেরিমেন্ট দাড়া করিয়েছিল, আর সেটা ভুলে যাওয়ার কারণে কীভাবে লেন্সের উপর রোদ পড়ে আগুন জ্বলে গিয়েছিল। সে বার বার করে বলল সে মোটেও ইচ্ছে করে করে নি, আগুন জ্বলে যাওয়াটা একটা দুর্ঘটনা ছাড়া কিছু না।

প্রিন্সিপাল স্যার এরকম সময়ে গাববুর আববু আর আম্মুর দিকে তাকিয়ে বললেন, “আপনারা তো নিজের কানে শুনলেন, নিজের চোখে দেখলেন। এখন আপনারাই বলেন এরকম একজন ছেলেকে কি আমার স্কুলের ছাত্র হিসেবে রাখা সম্ভব? নাকি রাখা উচিত?”

আববু একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, “আমি খুবই দুঃখিত। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি ভবিষ্যতে আর কখনো এরকম হবে না।”

আম্মুও সায় দিলেন, বললেন, “হ্যাঁ। আমরা কথা দিচ্ছি।” প্রিন্সিপাল স্যার শীতল চোখে কিছুক্ষণ তাদের দুজনের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তারপর নাক দিয়ে ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, “তার জন্যে খুব দেরি হয়ে গেছে। আমি আপনাদের ডেকেছি আপনাদের ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।”

আববু অবাক হয়ে বললেন, “নিয়ে যাওয়ার জন্যে!”

“হ্যাঁ। নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আমি অফিসে বলে রেখেছি তারা আপনার ছেলের জন্যে টিসি টাইপ করছে। টিসিসহ আপনি আপনার ছেলেকে নিয়ে যান।”

প্রিন্সিপাল স্যারের ঘরে যারা ছিল সবাই একসাথে চমকে উঠল। রওশন ম্যাডাম ব্যস্ত হয়ে বললেন, “এটা আপনি কী বলছেন স্যার? টিসি দেবেন কেন? একটু বকা দিয়ে ছেড়ে দেন। গাববু খুব ব্রাইট। লেখাপড়াতে ভালো। শুধু সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে নিজে বিপদে পড়ে, অন্যদেরও বিপদে ফেলে দেয়। এ ছাড়া তার আর কোনো সমস্যা নেই। ওকে কোনোভাবেই টিসি দিয়ে একেবারে স্কুল থেকে বিদায় করে দেওয়া ঠিক হবে না স্যার।”

রওশন ম্যাডাম যখন কথা বলছিলেন তখন সব ছেলেমেয়ে তার কথার সাথে সাথে মাথা নাড়তে লাগল। গাববুর কাজকর্মের কারণে তাদের নানারকম যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় সত্যি, কিন্তু তার জন্যে তাকে স্কুল থেকে বের করে দেওয়া হবে সেটা তারা কেউ কল্পনাও করতে পারে না।

প্রিন্সিপাল স্যার রওশন ম্যাডামের দিকে তাকিয়ে বললেন, “মিসেস রওশন, আপনি একটা খুব বড় জিনিস মিস করে যাচ্ছেন। আপনি তো নিজেই দেখলেন তার বিরুদ্ধে একটা দুইটা না, ছয়টা অভিযোগ। যারা অভিযোগ করেছে তারা সবাই এখানে হাজির, কোনোটাই মিথ্যা অভিযোগ না। সব সত্যি। একেবারে হাতেনাতে প্রমাণিত। অথচ আপনার এই ছাত্র সেগুলোর জন্যে দুঃখিত না। তার ভেতরে কোনো অনুশোচনা নেই। শুধু যে অনুশোচনা নেই তা নয়, পুরো ব্যাপারটা নিয়ে তার ভিতরে এক ধরনের আনন্দ। সে আনন্দে হাসছে। হাততালি দিচ্ছে। আপনি চিন্তা করতে পারেন? আমি যদি নিজের চোখে না দেখতাম তাহলে বিশ্বাসই করতাম না যে আমার স্কুলে এরকম একজন ছাত্র আছে।”

রওশন ম্যাডাম আবার চেষ্টা করলেন, বললেন, “স্যার, প্লিজ ব্যাপারটা একটু অন্যভাবে দেখেন। হি ইজ ভেরি ক্রিয়েটিভ।”

রত্না, মিলি আর ফারিয়াও গলা মেলাল, বলল, “মাপ করে দেন স্যার। আমরা আর কখনো নালিশ করব না।”

লিটন বলল, “জি স্যার মাপ করে দেন।”

রবিন বলল, “গাববুর মনটা খুব ভালো স্যার। শুধু একটু পাগলা টাইপের।”

প্রিন্সিপাল মাথা নাড়লেন, বললেন, “নো। হি হেজ টু গো। তাকে এই স্কুল থেকে বিদায় হতে হবে। এখন আর তাকে রাখা সম্ভব হবে না। এই ছেলেকে আমাদের স্কুলের প্রয়োজন নেই।”

রওশন ম্যাডাম বললেন, “প্লিজ স্যার। আরেকটা সুযোগ দেন। ওয়ান লাস্ট টাইম।”

প্রিন্সিপাল স্যার গর্জন করে উঠলেন, “ইম্পসিবল! হি ইজ আউট। স্কুল থেকে বিদায়।”

ঠিক এরকম সময় একজন পিয়ন ছুটতে ছুটতে এল, চাপা গলায় বলল, “স্যার! পুলিশ!”

প্রিন্সিপাল স্যার চমকে উঠলেন, “পুলিশ? পুলিশ কেন?”

পিয়ন মাথা নাড়ল, বলল, “জানি না স্যার।”

প্রিন্সিপাল স্যার জানালা দিয়ে তাকালেন, দেখলেন সত্যি সত্যি তার অফিসের সামনে একটা পুলিশের গাড়ি থেমেছে। সেখান থেকে বেশ কয়েকজন পুলিশ নামছে।

প্রিন্সিপাল স্যার পুলিশ দেখেই নার্ভাস হয়ে গেছেন। যদি নার্ভাস না হতেন তাহলে দেখতে পেতেন পুলিশের গাড়ির পেছনে একটা দামি গাড়ি। সেখান থেকে যারা নামছে তাদের সবাইকে না চিনলেও একজনকে ঠিকই চিনতেন, দেশের সবাই কয়েকদিনে তাকে চিনে গেছে।

মানুষটি হচ্ছে বিজ্ঞানী রিফাত হাসান।

১০

রিফাত হাসান ভোরবেলাতেই খবর পেয়ে গেলেন ডাবল ব্রাঞ্চিং ডাটাতে পেয়ার প্রোডাকশান নেই এরকম কেসগুলো আলাদা করে তাদের ডাটা এনালাইসিসের সময় দশ ভাগের এক ভাগ করে ফেলা গেছে। যার অর্থ এখন তারা দ্রুত তাদের কাজ শেষ করতে পারবেন, ইউরোপের একটা গ্রুপের সাথে তাদের প্রতিযোগিতা, সেই গ্রুপকে তারা এখন হেসে খেলে হারিয়ে দেবেন। রিফাত হাসানের মনটা ভালো হয়ে গেল এবং ঠিক করলেন ফিরে যাওয়ার আগে গাববুর সাথে একবার দেখা করে যাবেন। আধপাগল এই বাচ্চা সায়েন্টিস্টের সাথে তার যদি দেখা না হতো তাহলে ডাটা এনালাইসিসের এই চমকপ্রদ পদ্ধতিটার কথা তার মাথায় আসত না। তবে সমস্যা একটাই, গাববুর এই বিচিত্র নামটা ছাড়া তার আর কিছুই তিনি জানেন না।

রিফাত হাসান তখন তখনই ইউসুফকে ফোন করলেন এবং ইউসুফ তাকে বলল সে গাববুকে খুঁজে বের করে ফেলবে। নাস্তা করে রিফাত হাসান বিকালে একটা চাউস গাড়ি নিয়ে বের হলেন, সামনে পুলিশের গাড়ি, তারা বাঁশি বাজাতে বাজাতে যাচ্ছে। গাববুর সাথে যেখানে দেখা হয়েছে সেই মাঠের আশপাশে দোকানপাট বাড়িঘরে পুলিশ কথা বলল, নানা জায়গায় ফোন করল এবং তারা গাববুর স্কুলের নাম বের করে ফেলল। স্কুলের নাম বের করার পর কাজ খুব সহজ, রিফাত হাসান আবিষ্কার করলেন কয়েক মিনিটের মাঝে তারা স্কুলে চলে এসেছেন।

রিফাত হাসান গাড়ি থেকে নামতেই বেঁটে এবং কালো মতন একজন মানুষ তার দিকে ছুটে এল। মানুষটির গলা নেই, ধড়ের ওপর মাথাটা সরাসরি বসানো। রিফাত হাসান বুঝতে পারলেন তাকে দেখে এই মানুষটির ব্রেন শর্ট সার্কিট হয়ে গেছে এবং চেষ্টা করেও কথা বলতে পারছে না। মানুষটি তোতলাতে তোতলাতে বলল, “আ-আ-আ আমি এই স্কুলের প্রিন্সিপাল। স্যার, আ-আ-আপনি-আ-আ-আ আপনি?”

রিফাত হাসান প্রিন্সিপাল স্যারকে সাহায্য করলেন, বললেন, “জি। আমি। আমি রিফাত হাসান।”

“জানি স্যার। আ-আ-আপনাকে পরিচয় দিতে হবে না। স্যার। আ-আ-আপনাকে সবাই চিনে স্যার। আ-আ-আপনি স্যার আমাদের স্কুলে! কী সৌভাগ্য স্যার। স্যার, আমার কী সৌভাগ্য! আমার স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের কী সৌভাগ্য স্যার!”

“সৌভাগ্যের কোনো ব্যাপার নেই। আর সত্যি কথা বলতে কী, সৌভাগ্য যদি কারও হয় তাহলে সেটা আমার।”

প্রিন্সিপাল বিনয়ে একেবারে গলে গিয়ে হাত কচলাতে কচলাতে বললেন, “স্যার স্যার আসেন স্যার। আসেন স্যার আমার অফিসে।”

রিফাত হাসান প্রিন্সিপালের পেছনে পেছনে তার অফিসে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, “আমি আসলে আপনার স্কুলের একজন ছাত্রকে খুঁজতে এসেছি।”

প্রিন্সিপাল স্যার অবাক হয়ে গেলেন, “আমার স্কুলের ছাত্র?”

“জি। তার ভালো নাম জানি না। কোন ক্লাসে পড়ে সেটাও জানি না। তার নাম হচ্ছে গাববু। তার সাইজ এরকম-” রিফাত হাসান হাত দিয়ে গাববুর সাইজ দেখালেন।

প্রিন্সিপাল স্যারের মুখ শক্ত হয়ে গেল, “কী করেছে গাববু? কোনো সমস্যা স্যার?”

রিফাত হাসান জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, বললেন, “না, না! সমস্যা হবে কেন? হি ইজ ইনক্রেডিবল। আমি তাকে কংগ্রাচুলেট করতে এসেছি। গতকাল তার সাথে আমার দেখা হয়েছে, সে তখন আমাকে এমন একটা আইডিয়া দিয়েছে যেটা ব্যবহার করে আমি আমার এক্সপেরিমেন্টের ডাটা এনালাইসিসে রীতিমতো বিপ্লব করে ফেলেছি। আমি আজ চলে যাব, তাই ভাবলাম যাওয়ার আগে তার সাথে দেখা করে যাই। তাকে কি একটু খুঁজে দেওয়া যাবে?”

প্রিন্সিপালের অফিসে জড়সড়ো হয়ে দাঁড়ানো ছেলেমেয়েদের ব্যাপারটা বুঝতে একটু সময় লাগল। যখন পুলিশের গাড়ি করে লোকজন গাববুকে খোঁজ করতে এসেছে তখন তারা ধরেই নিয়েছিল গাববু আরও বড় ঝামেলায় পড়েছে। যখন দেখল গাববু ঝামেলায় পড়ে নি, বরং উল্টো গাববু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে ফেলেছে, তখন তাদের গলায় জোর ফিরে এল। তারা গাববুকে ধরে চিৎকার করে বলল, “এই যে! এই যে গাববু!”

রিফাত হাসান এবার গাববুকে দেখতে পেলেন, সাথে সাথে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। দুই হাত ওপরে তুলে বললেন, “হ্যালো ডক্টর গাববু! আওয়ার ফেমাস সায়েন্টিস্ট প্রফেসর গাববু! হাউ আর ইউ?”

গাববু বলল, “আপনি কি রাত দশটায় টেলিপ্যাথি করেছিলেন?”

রিফাত হাসান মুখে গাম্ভীর্য টেনে বললেন, “অবশ্যই করেছিলাম।”

“আমি আপনাকে যেভাবে শিখিয়েছিলাম সেইভাবে?”

“ইয়েস স্যার, সেইভাবে।”

“কোনো ম্যাসেজ কি পেয়েছিলেন?”

“উঁহু। তুমি?”

গাববু হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, বলল, “আমিও পাই নাই। আপনি কি ম্যাসেজ পাঠিয়েছিলেন?”

“পাঠিয়েছিলাম।”

গাববু গম্ভীর মুখে বলল, “আবার চেষ্টা করতে হবে।”

“অবশ্যই আবার চেষ্টা করতে হবে।” রিফাত হাসান তখন গলার স্বর পাল্টে বললেন, “প্রফেসর গাববু, আজকে আমি অন্য কাজে এসেছি। আজকে আমি তোমাকে বলতে এসেছি যে তোমার আইডিয়াটা অলরেডি কাজে লাগানো হয়েছে। চমৎকারভাবে কাজ করছে এবং ওয়ান্ডারফুল ফিজিক্স বের হচ্ছে।”

গাববু জানতে চাইল, “কোন আইডিয়াটা? টিকটিকির ডাবল লেজ?”

“না না। সেটা এখনো শুরু করি নাই। অন্য আইডিয়াটা, যেটা আছে সেটা না খুঁজে যেটা নাই সেটা খোঁজা।”

“ও।” গাববু মাথা নেড়ে বলল, “টিকটিকির ডাবল লেজ থিওরিটাও কিন্তু ভালো। মনে হয় কাজ করবে।”

প্রিন্সিপালের ঘরে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা এক ধরনের বিস্ময় নিয়ে গাববুর সাথে প্রফেসর রিফাত হাসানের কথা শুনছিল। গাববু এমনভাবে প্রফেসর রিফাত হাসানের সাথে কথা বলছে যেন দুজন সমবয়সি বন্ধু। কী সহজ একটা ভঙ্গি, কী আশ্চর্য!

রিফাত হাসান এবারে ঘুরে অফিস ঘরের অন্যদের দিকে তাকালেন। একটু হাসার ভঙ্গি করে বললেন, “আপনারা নিশ্চয়ই স্কুলের টিচার?”

রওশন ম্যাডাম বললেন, “জি। আমি গাববুর টিচার।” তারপর গাববুর আববু-আম্মুকে দেখিয়ে বললেন, “আর এঁরা হচ্ছেন স্যার বাবা মা।”

রিফাত হাসান চোখ বড় বড় করে বললেন, “ওয়ান্ডারফুল! শুধু যে গাববুর সাথে দেখা হল তা না। গাববুর বাবা-মায়ের সাথেও দেখা হয়ে গেল! চমৎকার!”

আববু-আম্মু কী বলবেন বুঝতে না পেরে হাসি হাসি মুখে করে দাঁড়িয়ে রইলেন। আম্মু বললেন, “কাল গাববু আপনার কথা বলছিল।”

“আমিও সবাইকে গাববুর কথা বলেছি।” রিফাত হাসান আম্মুর দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, “ইয়াং সায়েন্টিস্ট একটা ওয়াভারফুল জিনিস, কিন্তু বাবা-মায়ের বারোটা বেজে যায়!”

আববুও গলা নামিয়ে বললেন, “আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন।”

“আমার বাবা-মা প্রায় পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। একটু সহ্য করেন।”

আম্মু হাসার চেষ্টা করলেন, “আমরা চেষ্টা করি। কিন্তু শুধু আমরা করলে তো হয় না-অন্যেরা আছে।”

রিফাত হাসান অসম্ভব বুদ্ধিমান মানুষ এবং হঠাৎ করে প্রিন্সিপালের রুমে, গাববু গাববুর বাবা-মা, গাববুর ক্লাস টিচার, ছাত্রছাত্রী কেন হাজির হয়েছে তার কারণটা অনুমান করে ফেললেন। তিনি গাববুর দিকে তাকালেন, জিজ্ঞেস করলেন, “গাববু, তোমার খবর কী?”

গাববু হতাশভাবে মাথা নাড়ল, “খবর ভালো না।”

“ভালো না? সে কী! কেন?”

“আমাকে টিসি দিয়ে-”

প্রিন্সিপাল স্যার গাববুকে কথাটা শেষ করতে দিলেন না, মাঝখান থেকে গলা উঁচিয়ে বললেন, “স্যার বসেন। একটু চা খান।”

“না, না, চা খেতে হবে না। আমি গাববুর কথাটা শুনি। তার কী সমস্যা?”

প্রিন্সিপাল স্যার গলা উঁচিয়ে মাথা ঝাকিয়ে বললেন, “কোনো সমস্যা নাই স্যার। কোনো সমস্যা নাই। আমি থাকতে গাববুর এই স্কুলে কোনো সমস্যা হবে আপনি বিশ্বাস করেন?”

“অবশ্যই করি না।” রিফাত হাসান ব্যাপারটা নিয়ে আর অগ্রসর হলেন না। কোনো সমস্যা হয়ে থাকলেও সেটা যে মিটে যাবে কিংবা মিটে গেছে সেটা তিনি অনুমান করে ফেললেন। বললেন, “প্রিন্সিপাল সাহেব, গাববুর মতো এরকম ক্রিয়েটিভ ছেলে আপনার স্কুল থেকে বের হয়েছে সেটা খুব চমৎকার একটা ব্যাপার। আমরা কী ঠিক করেছি জানেন?”

“জি স্যার।”

“আমি আমার ইউনিভার্সিটির সাথে কথা বলেছি। আমরা ঠিক করেছি, আপনার স্কুলে চমৎকার একটা ল্যাব করে দিব। একটা ওয়ার্কশপসহ। সবকিছু থাকবে। সম্ভব হলে ক্রিয়েটিভ ছেলেমেয়েদের জন্যে স্কেলারশিপের ব্যবস্থা করব।”

“থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার।” প্রিন্সিপাল স্যার হাসি হাসি মুখ করে বললেন, “আমরাও চেষ্টা করি স্যার। আমরাও উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করি। এই যে দেখেন আজকেই আমরা আলোচনা

করছিলাম-” প্রিন্সিপাল স্যার টেবিল থেকে গাববুর দুধর্মের তালিকা লেখা কাগজটা তুলে রিফাত হাসানকে দেখিয়ে বললেন, “এই যে দেখেন, আজকেই আমরা আলোচনা করছিলাম। গাববু একদিনে ছয়টা বিজ্ঞানের প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করেছে। অসাধারণ! আমরা কী ঠিক করেছি জানেন স্যার?”

“কী?”

“আমরা স্যার স্কুল থেকে গাববুকে একটা মেডেল দিব। ইয়াং সায়েন্টিস্ট মেডেল।”

রিফাত হাসান বললেন, “ভেরি গুড। চমৎকার।”

গাববু জিজ্ঞেস করল, “তাহলে আমাকে আর টিসি দিবেন না স্যার! বলছিলেন যে টিসি দেবেন?”

রিফাত হাসান জানতে চাইলেন, “টিসি জিনিসটা কী?”

খুব একটা বড় রসিকতা হচ্ছে এরকম ভঙ্গি করে প্রিন্সিপাল হা হা করে হাসলেন, বললেন, “টিসি মানে অনেক কিছু হতে পারে, স্যার। কারও জন্যে টিসি হচ্ছে ট্রান্সফার সার্টিফিকেট। মানে স্কুল থেকে বিদায়, আর কারও জন্যে টিসি মানে টেন্ডার কেয়ার। মানে আলাদা করে যত্ন। আমাদের গাববুর জন্যে টিসি মানে হচ্ছে টেন্ডার কেয়ার। সবসময় টেন্ডার কেয়ার।”

এইবার লিটন একটু এগিয়ে এল, বলল, “কিন্তু স্যার একটু আগে যে বলছিলেন-”

প্রিন্সিপাল স্যার বিরক্ত হয়ে বললেন, “আহ! চুপ করো দেখি। দেখছ না আমরা কথা বলছি? বড়দের মাঝে কথা বলবে না।”

মিলি বলল, “তাহলে গাববু আমাদের সাথে থাকবে?”

“অবশ্যই থাকবে। আমরা কি গাববুকে অন্য কোথাও যেতে দেব? দেব না।”

রিফাত হাসান এবার গাববুর বন্ধুদের দিকে তাকালেন, জিজ্ঞেস করলেন, “তোমরা সবাই গাববুর সাথে পড়?”

সবাই মাথা নাড়ল। রিফাত হাসান বললেন, “আমার তো শুধু গাববুর সাথে পরিচয় হয়েছে, তোমাদের সাথে পরিচয় হলে হয়তো দেখতাম তোমরাও গাববুর মতো সায়েন্টিস্ট।”

লিটন মাথা নাড়ল, বলল, “উঁহু। আমাদের ক্লাসে শুধু গাববু হচ্ছে সায়েন্টিস্ট।”

“অন্যরা? অন্যরাও নিশ্চয়ই কিছু না কিছু?”

লিটন মাথা নাড়ল, বলল, “হ্যাঁ। এই যে রবিন, সে ফাটাফাটি ক্রিকেট খেলে। মিলি চোখ বন্ধ করে পরীক্ষা দিলেও ফার্স্ট হয়। ফারিয়া খুব সুন্দর গান গাইতে পারে। রত্না কবিতা লিখতে পারে।”

“তুমি?”

“আমি কিছু পারি না।”

রত্না বলল, “পারে। একসাথে দশটা হাম বার্গার খেতে পারে।”

লিটন রত্নার দিকে চোখ পাকিয়ে তাকাল, আশপাশে স্যার ম্যাডামরা আছেন তাই আর কিছু বলল না।

রিফাত হাসান বললেন, “সায়েন্টিস্টদের জীবন খুব কঠিন। তারা একটু অন্যরকম হয় তো, তাই তাদের বন্ধু বেশি হয় না। আমাদের গাববু তো খুব লাকি তার এতগুলো বন্ধু!”

ফারিয়া বলল, “জি স্যার, আমরা সবসময় গাববুকে সাহায্য করি। সে হাইব্রোমিটার না কী একটা মেশিন বানাবে-”

গাববু ঠিক করে দিল, “হাইব্রো না হাইগ্রোমিটার।”

“ওই একই কথা। হাইগ্রোমিটার বানানোর জন্যে লম্বা চুল দরকার। তাই আমাকে বলেছে, আমি সাথে সাথে তাকে এতগুলো চুল দিয়ে দিয়েছি। এই যে দেখেন-” ফারিয়া তার মাথার চুল সরিয়ে দেখাল সেখানে এক খাবলা চুল নেই।

রিফাত হাসান চমৎকৃত হলেন, বললেন, “অসাধারণ! বিজ্ঞানের জন্যে এরকম স্যাফ্রিফাইস খুব বেশি নাই।”

মিলি বল, “গাববু নার্ভ নিয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট করেছে, কাউকে চিমটি দেওয়া দরকার, তখন আমরা সবাই আমাদের হাতে চিমটি দিতে দিয়েছি।” মিলি দেখাল, “এই যে এইখানে চিমটি দিয়েছিল। লাল হয়েছিল।”

রিফাত হাসান কী বলবেন বুঝতে পারলেন না, তাই জোরে জোরে মাথা নাড়লেন। রত্না বলল, “কিন্তু স্যার গাববু কারও কথা শোনে না। তাকে একটু বলে দেবেন সে যেন আমার কথা একটু শোনে।”

“কেন? কী হয়েছে?”

“স্যার আমার মাকড়সা খুব ভয় করে-”

“তাই নাকি? আমারও মাকড়সা খুব ভয় করে। এর একটা নামও আছে, আরকোনোফোবিয়া।”

“জি স্যার। কিন্তু সায়েন্স এক্সপেরিমেন্ট করার জন্যে গাববু এই এত বড় একটা মাকড়সা ধরে আমাকে ভয় দেখিয়েছে।” কথাটা বলতে গিয়েই রত্না একটু শিউরে উঠল।

“তাই নাকি?” রিফাত হাসান গাববুর দিকে তাকালেন, “সত্যি?”

“কিন্তু এক্সপেরিমেন্টটা কাজ করেছে।”

“কাজ করলেও বন্ধুদের ভয় দেখিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা যাবে না। বন্ধু সায়েন্স থেকেও ইম্পরট্যান্ট। যার বন্ধু নেই তার কিছু নেই। ঠিক আছে?”

গাববু মাথা নাড়ল, বলল, “ঠিক আছে।”

প্রিন্সিপাল স্যার পাশে দাঁড়িয়ে উশখুশ করছিলেন। এত বড় এত বিখ্যাত একজন মানুষ। যিনি প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টের সাথে চা নাস্তা খান তিনি কিনা এইরকম ছোট ছোট বাচ্চাদের সাথে মাকড়সা নিয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করছেন, নিজের চোখে দেখেও বিশ্বাস হয় না। একটু কাশির মতো শব্দ করে বলেই ফেললেন, “স্যার”।

“জি।”

“আপনি আমাদের স্কুলে এসেছেন এত বড় একটা ব্যাপার, আমাদের সব টিচারদের সাথে যদি একটু চা খেতেন-”

রিফাত হাসান মাথা নাড়লেন, বললেন, “আসলে আমার একটু তাড়া আছে। দুপুরে প্লেন ধরতে হবে তো-”

রওশন ম্যাডাম বললেন, “তাহলে স্যার, আপনি একটু বারান্দায় দাঁড়ান, আমরা স্কুলের সব ছেলেমেয়েকে ডাকি। তারা নিজের চোখে আপনাকে একটু দেখুক।”

“লেখাপড়ার ক্ষতি করে আমাকে দেখবে?”

“জি স্যার। একটু লেখাপড়ার ক্ষতি হলেও হাজার গুণ বেশি লাভ হবে!”

রিফাত হাসান হাসলেন, বললেন, “ঠিক আছে!”

মিনিট দশেক পর স্কুলের ছেলেমেয়েদের ভিড় ঠেলে রিফাত হাসান যখন তার গাড়িতে উঠছেন তখন গাববুকে ডাকলেন। বললেন, “আমি যাচ্ছি। যোগাযোগ রেখো।”

“ঠিক আছে।”

“শুধু টেলিপ্যাথির উপর ভরসা না করে ই-মেইল করা যেতে পারে।”

“ঠিক আছে।”

গাববু কিছু একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল। রিফাত হাসান জিজ্ঞেস করলেন, গাববু, “তুমি কিছু বলবে?”

“জি।”

“বল।”

“আমার আপুর খুব ইচ্ছা সে আপনার সাথে একটা ছবি তুলবে আর একটা অটোগ্রাফ নেবে!”

“কোথায় তোমার আপু? ডাকো।”

ইউসুফ চাপা গলায় বলল, “স্যার দেরি হয়ে যাবে।”

রিফাত হাসান বললেন, “হোক!”

টুনির সাথে ছবি তোলার পর আরও অনেকের সাথে ছবি তুলতে হল, আরও অনেকে অটোগ্রাফ দিতে হল। অন্য কেউ হলে ফ্লাইট মিস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, গাববু জানে রিফাত হাসানের সেই ভয় নেই। দরকার হলে এয়াপোর্টে তার জন্যে প্লেন দাঁড়িয়ে থাকবে।

পুলিশের গাড়ি সাইরেন বাজাতে বাজাতে রিফাত হাসানের গাড়িটাকে নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার পর টুনি গাববুর কাছে ছুটে এল, তারপর সবার সামনে তাকে চেপে ধরে তার দুই গালে ধ্যাবড়া করে চুমু খেল। গাববু অসম্ভব বিরক্ত হয়ে বলল, “আপু, ভালো হচ্ছে না কিন্তু। তুমি এরকম করলে আমি কখনো তোমাকে নিয়ে ছবি তোলার কথা বলতাম না। তুমি জান মানুষের মুখের লালায় কত ব্যাক্টেরিয়া থাকে?”

গাববুর কথা শুনে টুনি গাববুকে আরও জোরে চেপে ধরে আরও জোরে তার গালে ধ্যাবড়া করে চুমু খেল।

কী একটা লজ্জার ব্যাপার। ছিঃ ছিঃ ছিঃ।